দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

আর্য আক্রমণ তত্ত্ব ও চিন্তা-বিকৃতি

— পৃষ্ঠা : ১৪

মুসলমান মহিলাদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে মৌলবিতন্ত্র

— পৃষ্ঠা : ৩০

৬৮ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ২০ জুন ২০১৬।। ৫ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

তালাক তালাক তালাক

মহিলাদের প্রতি ন্যায়বিচার ?

স্বস্তিকা

*।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৮ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ৫ আষাঢ়, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২০ জুন - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

পশ্চিমবাংলায় বাম ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই, বিরোধীদলের শূন্যতাকে পূর্ণ করবে বিজেপি
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : দিদি কেনা ভোটে জিতেছেন
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ছাবাহার — মোদির উষ্ণীষে আর একটি উজ্জ্বল পালক
▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ১২

আর্য আক্রমণ তত্ত্ব ও চিন্তাবিকৃতি ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১৪

ফ্যারাওদেরও আগে ▯ নলিন মেহতা ▯ ১৭

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ▯ প্রণব বর ▯ ২১

দাসপুরের মা আনন্দময়ী কালী ▯ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ▯ ২২

পানিহাটির দন্ড মহোৎসব ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ২৩

নীতি ও পন্থা এক ভারসাম্যের বিষয়
▯ কে এন গোবিন্দাচার্য ▯ ২৭

শাহবানু থেকে সায়রা বানু : মুসলমান মহিলাদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে মৌলবিতন্ত্র ▯ দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩০

বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতনতা দিবসে কেমন আছেন আমাদের প্রবীণ নাগরিকেরা? ▯ এন সি দে ▯ ৩২

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার লক্ষ্যে চলেছে হিন্দুনিধন ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮
▯ খেলা : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯
প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৭ জুন, '১৬

প্রকাশিত হবে
২৭ জুন, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নতুন সরকার, নতুন অসম

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দাপটে অসমের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বিদেশি বিতাড়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য অসমে বিজেপি-জোট এই প্রথম সরকার গঠন করেছে। সর্বানন্দ সোনোয়ালের মুখ্যমন্ত্রিত্বে এই নতুন সরকার কীভাবে নতুন অসম গড়ে তুলতে পারে এই সংখ্যায় এটাই আলোচ্য বিষয়। লিখেছেন— বিশিষ্ট সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক, অভিমন্যু গুহ, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন

সম্প্রতি বাংলাদেশে নূতন করিয়া হিন্দু নির্যাতন শুরু হইয়াছে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা এই প্রথম নহে। দেশভাগের পর হইতেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবেই হিন্দুরা অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে। সামরিক, আওয়ামি বা বিএনপি যে সরকারই সেখানে থাকুক না কেন, হিন্দুদের উপর অত্যাচারে কখনও ছেদ পড়ে নাই, মাত্রায় কম-বেশি হইয়াছে মাত্র। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারত সেই দেশের মানুষের পাশে থাকিয়া সর্বতোভাবে সহায়তা করিয়া বাংলাদেশ সৃষ্টির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। বর্তমানে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারও বাংলাদেশের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু ঘটনা হইল, ইহাতে হিন্দুদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তাহারা বরাবরই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছে।

গত তিন মাসে বাংলাদেশে বারোজন হিন্দুকে নৃশংসভাবে খুন করা হইয়াছে। আহত হইয়াছেন কমবেশি সাড়ে তিনশতজন। অপহরণ করা হইয়াছে দশজনকে। আটজন হিন্দু নারী ধর্ষণের শিকার হইয়াছেন। সম্পত্তির উপর চলিয়াছে হামলা, লুঠতরাজও। ১৫ জানুয়ারি নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে নবম শ্রেণীর ছাত্র তপন ভৌমিককে। ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড় জেলার গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়-কে খুন করা হইয়াছে। এই ভাবে ঝিনাইদহে খুন হইয়াছেন পুরোহিত আনন্দগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, সাবনা জেলার হেমায়তপুরে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সেবাশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করিয়া দেওয়া ভাল। সম্প্রতি বাংলাদেশে কয়েকজন মুসলমান ব্লগারদেরও হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহারা ইসলাম ধর্মের নামে মৌলবাদী গোষ্ঠীর আচরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন। অন্যদিকে আনন্দমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বা নিত্যরঞ্জনের মতো মানুষেরা কোনো সাতে-পাঁচে নাই, অন্য কোনো ধর্মকে আঘাত করিয়াছেন এমন কোনো ঘটনার কথাও জানা যায় নাই। প্রশ্ন হইল, তাহা হইলে বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু পুরোহিত বা বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করা হইতেছে কেন? এটা কি 'এথনিক ক্লিনজিং'? হিন্দুদের কি এই বার্তাই দেওয়া হইতেছে যে তোমরা এই দেশে নিরাপদ নও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় হও?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত ভাগের গুরুত্বপূর্ণ শর্তই ছিল, স্ব স্ব ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যাবতীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব সেই দেশের সরকার গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। পাকিস্তান তাহা কোনো দিন স্বীকার করে নাই। বাংলাদেশও সেই একই পথ অনুসরণ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতে হিন্দু শরণার্থীদের বাস্তবতাই তাহা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। দেশভাগের সময় ও বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতও একই কথা বলে।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন সেই দেশে নিজেদের আর নিরাপদ বোধ করিতেছে না। বিষয়টিতে ভারত সরকারের দ্রুত ও আন্তরিক হস্তক্ষেপের জন্য তাহারা আবেদন জানাইয়াছে। ইহাতে দেশের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া বাংলাদেশের মন্ত্রী ও কিছু মানুষ অভিযোগ করিয়াছেন। অভিযোগ করা যাইতেই পারে কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের এই দাবি যথার্থ। কেননা ইহা দেশভাগের শর্তাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের নিরাপত্তার বিষয়টি সেই দেশের একান্ত অভ্যন্তরীণ বিষয় হইতে পারে না। কেননা সংবেদনশীল এই ইস্যু যে-কোনো সময়ে এই দেশে অস্থিরতার বাতাবরণ সৃষ্টি করিতে পারে। এই ষড়যন্ত্রকে তাই প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও নীতিগতভাবে মনে করিয়া থাকে বিশ্বের সব হিন্দুরই শেষ ঠিকানা ভারতবর্ষ। ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হইয়া যাঁহারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ইতিমধ্যেই তাঁহাদের এখানে বসবাসের অনুমতি দিয়াছে বিজেপি সরকার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মোদী সরকার যে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে, একইভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। মোদী সরকার যত শীঘ্র এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত ভাঙিতে পারিবে ততই মঙ্গল।

সুভাষিতম্

কৃপণেন সমো দাতা ভুবি কোঽপি ন বিদ্যতে।
অনশ্নন্নেব বিত্তানি যঃ পরেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।। (মনুস্মৃতি)

কৃপণের মতো দাতা পৃথিবীর কোথাও হয় না। কেননা তারা ধনসম্পদ নিজেরা ভোগ না করে অন্যের জন্য গচ্ছিত রেখে যায়।

অস্তিত্ব লোপাটের আশঙ্কায় দিশেহারা বঙ্গ-সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দশ বছর আগে রাজ্যের এক মুখ্যমন্ত্রীর গর্বোদ্ধত উক্তি ছিল, 'আমরা দুশো তিরিশ, ওরা শুধু তিরিশ'। রাজ্যের তৎকালীন শাসকদল রীতিমতো হাতে মাথা কাটতো তখন। কিন্তু সেই বুদ্ধ ও নেই, সিপিএমের জমানাও নেই। কিন্তু গত দশ বছরে সিপিএমের যে হাঁড়ির হাল হয়েছে তাতে আলিমুদ্দিনের ভিটেতে চরতে ঘুঘুরও এখন সম্মানে বাধছে। বিরোধী দলের সম্মানটা তো গেছেই, পার্টিগতভাবে বিপদ আরও বেড়েছে। যে পশ্চিমবঙ্গকে এক সময় সিপিএমে বলা হতো পার্টির নিউক্লিয়াস। বলা ভালো, এরাজ্যে যে ক্ষমতায়নের সুবাদে গোটা দেশে মৌরসিপাট্টা কায়েম করতে পেরেছিল পার্টি, এবার রাজ্যসভায় সেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজনও সদস্য না পাঠানোর সম্ভাবনা। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় সিপিএমের সদস্য সংখ্যা তিন। এর মধ্যে পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও রয়েছেন। আপাতত সামনে কোনো রাজ্যসভার ভোট না থাকলেও আগামী বছর রয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের জন্য সিপিএমের বঙ্গ বিগ্রেড লম্ফ-জম্প করলেও তারা ভালো করেই জানে নিজেদের প্রার্থীকে জেতানোর পর সিপিএমের রাজ্যসভার প্রর্থীকে জেতানোর জন্য কংগ্রেসের ভোটের ছিঁটেফোঁটাও থাকবে না। সুতরাং সে গুড়ে বালি। এখন সিপিএমের জোট প্রার্থী নেতাদের একটাই স্বপ্ন কংগ্রেসের ঘাড়ে চড়ে যদি গতবার লোকসভায় জেতা দু'টো আসন ধরে রাখা যায়। নইলে দিল্লীতে বাতি দেওয়ার মতো বঙ্গ সিপিএমের কেউ থাকবেন না।

একদিকে পার্টিগতভাবে গুরুত্বহীন হওয়া, অন্যদিকে ভোটের অঙ্কে অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা বঙ্গ সিপিএমকে মরিয়া করে তুলেছে। তাই গত ১১ জুন রাজ্য-কমিটির বৈঠকে রীতিমতো হুমকি দিয়েছে সিপিএমের বঙ্গ-বিগ্রেড। সিপিএমের মতো রেজিমেন্টেট দলে দলীয় শৃঙ্খলায় কীভাবে পচন ধরেছে ১১ জুনের ঘটনা তারই প্রকৃত নিদর্শন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যেখানে এরাজ্যের অধিকাংশ নেতার স্পষ্ট মনোভাব প্রয়োজনে পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত অমান্য করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ধরে রাখা হবে।

অন্যদিকে এরাজ্যের জোট-বিরোধী কিছু নেতা ও পলিটব্যুরোও ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে রাজ্য-নেতারা কেন্দ্রীয় নেতাদের কথা না শুনলে, জেলা-নেতারাও রাজ্য-নেতাদের কথা মানবেন না। এইরকম বিশৃঙ্খল, অরাজক অবস্থা স্বাধীনোত্তর ভারতে সিপিএম দেখেনি বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

এমনকী সঙ্কট তৈরি হয়েছে বামফ্রন্টের ক্ষেত্রেও। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক গালমন্দ খেতে হয়েছে শরিকদলগুলির কাছ থেকে। শরিকদলগুলি দেখেছে তাদের মিলিত আসন সংখ্যা ছয়। সুতরাং তাদের আর হারাবার কিছু নেই। কংগ্রেস এল কী গেল তাতে তাদের আসন সংখ্যার বা প্রায় নিঃশেষিত ভোটব্যাঙ্কের নতুন করে আর কী ক্ষতি হবে! অন্যদিকে সিপিএমও বুঝে গিয়েছে শরিকদের নিয়ে চলাও যা, না চলাও তা। এদের না আছে ভোটব্যাঙ্ক,না আছে পার্টিকর্মী। সেদিক দিয়ে কংগ্রেস নিরাপদ। কংগ্রেসী ভোটব্যাঙ্ক এবার সিপিএমের বাক্সে নাই আসুক, আপাতত তলানিতে যাওয়া অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই হাল ছাড়তে নারাজ পার্টির বঙ্গ-ব্রিগেড। কারাটপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ পলিটব্যুরোর অবস্থাও এখন ধরি মাছ না ছুঁই পানি। দেওয়াল লিখন তাঁরা পড়তে পেরেছেন। বাংলাকে তাঁরা পুরো খরচার খাতায় ফেলে দিয়েছেন। বরং এরাজ্যে জোটের ফলে কেরল ও ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সাইনবোর্ডও উঠে যাবার জোগাড় এটুকুই এদের আশ্বস্ত করেছে। তবে বিরোধের ক্ষেত্রটা কোথায়? রাজনৈতিক মহল মনে করছেন বাংলা থেকে সিপিএমের নিউক্লিয়াস অন্যত্র সরছে, এটাই বর্তমান পার্টিতে অপাংক্তেয় বঙ্গনেতৃত্ব মেনে নিতে পারছে না।

তাই তারা এরাজ্যের নাগরিকদের ভুল বোঝাতে মরিয়া চেষ্টা করছে যে তৃণমূল-বিজেপির গোপনে জোট হয়েছিল, তাই এই বিপর্যয়। সিপিএমের সূর্যকান্ত মিশ্র, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের এই বক্তব্যে রীতিমত হাসাহাসি শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কারণ বিজেপির সৌজন্যেই ভোটের মুখে নারদ কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসে এবং যার সুযোগ নিতে আরেক দুর্নীতিবাজ সিপিএম ও কংগ্রেস মরিয়া চেষ্টা করে। এমনকী সিপিএমের ইদানীন্তন দেশ-বিরোধিতাজনিত কুকর্মের দোসর একটি সংবাদমাধ্যম 'বিজেপি-র সৌজন্যে' সেই নারদকাণ্ড বারংবার সম্প্রচার করে এবং জোটের পক্ষে ভোট টানার চেষ্টার পাশাপাশি বিজেপিরই বাপবাপান্ত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পার্টির একটা অংশ ওই সংবাদ-গোষ্ঠীর ভূমিকাকে মোটেও ভালো চোখে দেখছে না। তারা মনে করছে ভোটের মুখে দেশ-বিরোধী কাজকর্মকে প্রশ্রয় দিয়ে এরা যা সম্প্রচার করেছে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জনমানসে তৈরি হয়েছে এবং যার মাশুল গুনতে হয়েছে দলকে। মুখে কিছু না বললেও আড়ালে আবডালে তাঁরা মন্তব্য করছেন এমন বন্ধু থাকলে আর শত্রুর দরকার কী!

বাংলাদেশ : হিন্দু নিধন রোধে মোদীর হস্তক্ষেপ দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস এবং একের পর এক হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে সে দেশের হিন্দুরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপ দাবী করছেন। তাদের বক্তব্য, হিন্দুরা বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুরা সবসময়েই নিজভুমে পরবাসী। আই এস এবং জামাতের জঙ্গিরা হিন্দুদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাসগুপ্ত বলেছেন, 'আমাদের মনে হয় হিন্দু-প্রধান দেশ হিসেবে ভারতের কিছু করা দরকার। ভারত সরকার যদি আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে কথা বলে তা হলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

সম্প্রতি এক যাটোর্ধ্ব আশ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে আই এস জেহাদিরা। নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে নামের ওই হিন্দু আশ্রমিক সাম্প্রতিককালে ঘটে চলা অবিরাম হিন্দু নিধনপর্বের চতুর্থ শিকার। এর আগে একজন হিন্দু পুরোহিত, একজন দরজি, সন্ত্রাসবিরোধী এক পুলিশ অফিসারের স্ত্রী এবং একজন উদারমনা অধ্যাপককে হত্যা করেছে জেহাদিরা। হিন্দুরা ছাড়াও মারা গেছেন একজন খৃষ্টান ব্যবসায়ী এবং একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ এবং মৌলবাদীরা বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করতে চায়। বাংলাদেশ যদি ক্রমশ কট্টর ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। আর ভারত যদি এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চায় তাহলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

উত্তরপ্রদেশের কইরানায় মুসলমানদের অত্যাচারে ঘরছাড়া ৩৪৬টি হিন্দু পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তরপ্রদেশের কইরানা লোকসভা ক্ষেত্র থেকে ৩৪৬টি হিন্দু পরিবার মুসলমানদের বর্বরোচিত অত্যাচারে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কইরানার বিজেপি সাংসদ হুকুম সিং উদ্যোগ নেওয়ার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সাংসদ তাঁর অভিযোগ পত্রে, 'একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সমাজবিরোধী' বলে বর্ণনা করলেও ওয়াকিবহাল সূত্রের খবর অনুযায়ী অপরাধীরা সকলেই মুসলমান। এলাকাটি হিন্দুশূন্য করার জন্যেই এই কাণ্ড বলে অনেকের অভিযোগ। হুকুম সিং-য়ের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব-সরকারের কাছে নোটিস পাঠিয়েছে। যেসব পরিবার এলাকা ছেড়ে গেছে তারা এখন কোথায় আছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চার সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে।

কইরানায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার একদিনের ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। ৩৪৬টি পরিবার তাদের বাড়ি এবং ব্যবসাপত্র জলের দরে বিক্রি করে চলে গেছে। দিনের পর দিন নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। হুকুম সিং বলছেন, 'আগে অত্যাচার শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। যাঁদের বড়ো বাড়ি বা ব্যবসা আছে তাঁরাই টার্গেট হতেন। আমি তিনটে পরিবারকে চিনি যাঁদের বেশ বড়ো ব্যবসা ছিল। কিন্তু এখন এসব গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ছে।'

এদিকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য-বিজেপিও ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের রাজ্য-সম্পাদক কেশব প্রসাদ মৌর্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির নেতৃত্বে আছেন বিধায়ক সতীশ মাহানা। কইরানায় গিয়ে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে কমিটি তার রিপোর্ট দাখিল করবে। মৌর্য বলেছেন, 'কইরানার হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে সরকার পারবে কী পারবে না সেটা সরকারকেই বলতে হবে।' সেই সঙ্গে তিনি 'এরকম একটি সংবেদনশীল ঘটনায়' মায়াবতী এবং কংগ্রেসের নীরবতাকে 'বুদ্ধির অগম্য' বলে কটাক্ষ করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে উত্তেজনা

বিশেষ সংবাদদাতা ॥ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম পাঁচ বছরের শাসনকালে মুসলমান তোষণ নীতির কুফল দেগঙ্গা, উস্তি, কালিয়াচক, ক্যানিং সহ পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই দেখা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীপদে শপথ নেওয়ার অব্যবহিত পরেই সেই একই ধারা বজায় রেখে চন্দ্রকোণার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজারেও চলতি মাসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সূত্রপাত গত মঙ্গলবার (৭ জুন) ৬০০ বছরের পুরানো কেশবেশ্বর মন্দিরে নামসংকীর্তনকে কেন্দ্র করে। এদিন রমজান মাসের প্রথম দিনে স্থানীয় মুসলমানরা মন্দিরের সকাল-সন্ধ্যা নাম সংকীর্তন নিয়ে আপত্তি তোলে। হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। আজান এবং মন্দিরের সংকীর্তন যাতে যথাবিহিত সময়ে হয়, তারজন্য মন্দির বাজার মার্কেট কমিটির সদস্যরা একটা সমাধানে আসার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মুসলমানরা রমজানের সময় মন্দিরের কীর্তনের বিরোধিতা করে এবং মন্দিরের মাইক্রোফোন খুলে নেওয়ার হুমকি দেয়।

এরপর এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ১২ জুন, রবিবার মার্কেট কমিটির সদস্য, মন্দিরের সেবক, স্থানীয় মানুষজন ও রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনা চলাকালীন, মুসলমান দুষ্কৃতীরা হঠাৎই মন্দির সংলগ্ন বাজারের হিন্দুদের দোকানে আক্রমণ করে ও মন্দিরের অঞ্চল থেকে বহু হিন্দু এসে ভিড় জমায় এবং মন্দির পাহারার ব্যবস্থা করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মন্দিরবাজার থানা থেকে প্রচুর পুলিশ যথাসময়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। র‍্যাফও নামানো হয়। তৃণমূল কংগ্রেস-ঘেঁষা মুসলমান সংগঠক রইশ মোল্লা এই ইসলামি

দুষ্কৃতীদের হামলার পর মন্দিরে পুলিশ প্রহরা।

মাইক টেনে নামানোর চেষ্টা করে। এই আক্রমণের সূত্রপাত ওইদিনই বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে কেশবেশ্বর মন্দিরে ভোগারতির পূর্বে শুরু হওয়া 'হরে কৃষ্ণ' নামগান শুরু হওয়ার পর। এই পরিস্থিতিতে অবশ্য হিন্দুরাও সাহস করে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে দুষ্কৃতীদের বাধা দেয়। খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্র ধানকাটা, লক্ষ্মীকান্তপুর, শুকদেবপুর এবং সংলগ্ন হিন্দু তাণ্ডবের পিছনে আছে বলে সূত্রের খবর।

স্থানীয় বিজেপি নেতা নবেন্দু হালদার মন্দির বাজার থানায় গিয়ে হিন্দু মন্দির ও সম্পত্তি রক্ষার আবেদন জানান। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের শক্তি, অধিকার ও সম্মান রক্ষায় বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছে। পরিস্থিতি এখন আয়ত্তের মধ্যে আছে বলে খবর।

গোর্খারা এদেশের সম্পদ : ড. জিতেন্দ্র সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, 'কঠিন সময়ে গোর্খা সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগ ও বলিদান এদেশ কখনও ভুলবে না। গোর্খাদের সাহস, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব এবং দেশপ্রেম অন্যদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।' সম্প্রতি গোর্খা সম্প্রদায়ের জাতীয়স্তরের সংগঠন ভারতীয় গোর্খা পরিসঙ্ঘের সঙ্গে একটি আলোচনাচক্রে মন্ত্রী একথা বলেন। আলোচনায় গোর্খা নেতারা তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া দাবিগুলি অবিলম্বে পূরণ করার দাবি জানান। তাঁদের দাবির মধ্যে অন্যতম উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন। ভারতে বসবাসকারী

এক কোটি গোর্খার মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ বাস করেন এই অঞ্চলে। কিন্তু ভারতের উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র দেশের মধ্যে অন্যতম অনুন্নত ক্ষেত্র। তাই তাঁরা উন্নয়নে আরও গতি আনার জন্যে মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

গোর্খা প্রতিনিধি দলের প্রধান এস এম মোকতান জানিয়েছেন, এ দেশে গোর্খাদের মূল সমস্যা হলো তারা যে ভারতের নাগরিক তার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাব। অনেকেই মনে করেন গোর্খারা বিদেশি অথবা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী। অনেক রাজ্যে ভোটার তালিকাতেও তাদের নাম নেই। তাঁর দাবি সরকার অবিলম্বে গোর্খাদের অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) মর্যাদা দিক। যাতে গোর্খারা সরকারের নানা আর্থিক সাহায্যের সুবিধে নিতে পারে। সেই সঙ্গে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে নেপালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তারা জানান। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং ধৈর্য ধরে সব কথা শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে রয়েছেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, পশ্চিমবঙ্গের সাপ্তাহিক 'বর্তমান' পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও অন্য অধিকারীগণ। উল্লেখ্য, রন্তিদেববাবু প্রধান অতিথি রূপে আমন্ত্রিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে রন্তিদেববাবু বলেন, পাকিস্তান ও চীন ভারতের ক্ষতি করতে চায়। বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ও আগ্রাসী ঘটনায় তার প্রমাণ মিলেছে। তিনি আরও বলেন, সঙ্ঘ স্বামীজীর স্বপ্নের কাজ করে চলেছে। অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন সরসংঘচালক মোহনজী।

উবাচ

প্রণব মুখোপাধ্যায়
রাষ্ট্রপতি

"অতীতের ঘটনার প্রভাবের ছাড় নিয়ে আবেদন অসাংবিধানিক।"

'অফিস অফ প্রফিট'-এর থেকে ২১ জন আপ বিধায়ককে ছাড় দেওয়ার জন্য দিল্লী বিধানসভায় গৃহীত বিলে সম্মতি দেওয়া প্রসঙ্গে।

বোম্বে হাইকোর্ট

"এটা আমাদের বলার অধিকার আছে যে সিনেমা কখনও ড্রাগের প্রশংসা করতে পারে না। এখনও পর্যন্ত বলা যায় ড্রাগ হচ্ছে খারাপ। এই সিনেমা সাধারণ মানুষকে এর থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। রাজ্য বা তার লোকেদের কলুষিত করার উদ্দেশ্যে এটা তৈরি হয়নি।"

'উড়তা পাঞ্জাব' সিনেমার শুনানি প্রসঙ্গে।

সর্দার সিং
ক্যাপ্টেন, ভারতীয় হকি টিম

"হকি যদি না খেলতাম, তাহলে আমিও ওদের একজন হতাম।"

পাঞ্জাবে অত্যধিক মাদক ক্রীড়াসক্তদের প্রসঙ্গে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী

"চীন হচ্ছে সব থেকে বড় বিশ্বাসভঙ্গকারী।"

পল রাইন
ইউ এস কংগ্রেসের স্পিকার

"ভারত সরকার আমেরিকার সম্মাননীয় শরিক হতে চলেছে। এই সম্পর্ককে বজায় রাখা দরকার।"

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফর প্রসঙ্গে।

পশ্চিমবাংলায় বাম ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই

বিরোধীদলের শূন্যতাকে পূর্ণ করবে বিজেপি

গূঢ় পুরুষের কলম

বিজেপিকে সাধারণের চোখে খাটো করে দেখাতে সম্প্রতি অতি তৎপর হয়েছে কলকাতার একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র। বিধানসভার নির্বাচনের আগে এই সংবাদপত্র এবং তার দোসর টিভি চ্যানেল বাম-কংগ্রেস জোটকে জেতাতে প্রাণপাত করেছে। কিন্তু অশ্বডিম্ব প্রসব করা ছাড়া সেই প্রচারে দ্বিতীয় অন্য কোনো ফল হয়নি। বামেদের প্রচারে কোটি কোটি টাকা ঢেলেছিলেন এই সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মালিকরা। কারণ, প্রায় সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকার জমি নামমাত্র মূল্যে হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল তারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাধা দেওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। মালিকদের স্বার্থে আঘাত লাগায় ফুঁসে উঠেছিল সংবাদপত্র গোষ্ঠীর তাবৎ সাংবাদিকরা। মালিকদের স্বার্থরক্ষায় তখন সাংবাদিকদের মধ্যে শুরু হয়েছিল 'কেবা আগে প্রাণ করিবেন দান' সেই নিয়ে কাড়াকাড়ি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলমান তোষণ থেকে অসত্য উন্নয়নের দাবি নিয়ে সমালোচনা করা যেতেই পারে। তবে অতি প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমের এই মালিকদের অন্যায় লোভের কাছে মাথা নত না করার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতেই হবে। বিশেষত যেখানে তাঁর দলের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতাকেই সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মালিকরা তাঁদের পকেটে পুরে ফেলেছিলেন।

এখন এই সংবাদমাধ্যমের মালিকরা মমতার অনুগ্রহ পেতে বিজেপি বিরোধী হয়েছেন। তাঁরা বুঝেছেন যে পশ্চিমবাংলায় বামেদের এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। বিরোধী দলের এই শূন্যতাকে পূর্ণ করবে বিজেপি। তাই বিজেপিকে হেয় করলে মমতা দিদি তুষ্ট হয়ে তাঁদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারি বিজ্ঞাপণ আবার চালু হতে পারে। সম্ভবত একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সাংবাদিকরা মানুষের স্বার্থে নয়, কাগজের মালিকদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করেন। এটা কোনো বিশেষ সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা নয়। রাজ্যের সমস্ত বড় বড় সংবাদপত্রের সাংবাদিকরাই সাংবাদিকতার নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে পরিচালকদের পদলেহন করেন। নবীন প্রজন্মের এই বাঙালি সাংবাদিকরা প্রাণের ঝুঁকি আছে এমন খবর সংগ্রহ করতে যান না। তাঁরা গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতার গালভরা বুলি দু'কলম লিখে সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই ধর্ম নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা তাণ্ডব চালায়, অন্যত্র নয়। তার তদন্তমূলক রিপোর্ট লিখতে আমার তরুণ সাংবাদিক ভাইদের এত অনীহা কেন? অথচ আফগানিস্তান, সিরিয়াতে ইসলামি জঙ্গিদের হাতে প্রাণ যেতে পারে জেনেও বিদেশি সাংবাদিকরা কাজ করছেন। ইসলামের নামে কীভাবে প্রতিদিন হত্যার মিছিল চলছে তা বিদেশি সাংবাদিকরাই তুলে ধরছেন। বাঙালি সাংবাদিকরা নয়। ভারতের সংবাদমাধ্যমের মালিকদের হাতে হাজার হাজার কোটি টাকা আছে। তাঁরা কি পারেন না আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক বা আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে অ-মুসলমানদের উপর যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার চলছে তার চোখে দেখা টাটকা প্রতিবেদন তুলে ধরতে অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের পাঠাতে? কলকাতারই মেয়ে জুডিথ ডি সুজাকে আফগানিস্তানের কাবুল শহরে জঙ্গিরা অপহরণ করেছে। জুডিথ সেখানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি হয়ে আফগান মেয়েদের স্বনির্ভর করার কাজ করছিলেন। তিনি জানতেন ইসলামি মৌলবাদীরা মেয়েদের যৌনদাসী বলে মনে করে। মেয়েদের শিক্ষার অধিকারকে তালিবানরা ধর্মবিরোধী বলে মনে করে। তালিবানরা প্রাণ কেড়ে নিতে পারে জেনেও জুডিথ কাবুলে মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কলকাতার সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মালিকরা ই এম বাইপাশ সংলগ্ন সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকার জমি হাতাতে কোটি কোটি টাকা ছড়াতে পারেন। কিন্তু একজন সাংবাদিককে কাবুলে পাঠাতে পারেন না। সংবাদপত্রের অফিসে বসে টেলিফোনে দু' চারটে কথা বলে অর্ধসত্য প্রতিবেদন লেখা যায়। কিন্তু পাঠকের মন পাওয়া যায় না। স্বীকার করছি যে ভারতীয় সংবিধান সাংবাদিকদের খবর সংগ্রহের জন্য বিশেষ অধিকার দেয়নি। সাংবাদিকদের স্বাধীনতার কোনো আইনি গ্যারান্টি নেই। তবু বিপদ আছে জেনেও এই পেশায় সাহসীরা আসেন। ভারতের অন্য দুটি রাজ্যে দু'জন সাংবাদিক সম্প্রতি খুন হয়েছেন। তাঁদের অপরাধ তাঁরা রাজনীতিক— মাফিয়া চক্রের অপরাধ ফাঁস করেছিলেন। হ্যাঁ, এটাই সাচ্চা সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে অন্য পেশায় যান। হায়! বাঙালি সাংবাদিকরা কবে এই কথাটা বুঝবেন।■

দিদি কেনা ভোটে জিতেছেন

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দিদি আপনি কী করে জিতলেন, বিপুলভাবে জিতলেন তা নিয়ে নানা মহলে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আপনার সম্পর্কে, আপনার দলের সম্পর্কে এতো অভিযোগ তবুও আপনার জয় নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রশ্নের একটা বড় উত্তর বলছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

অর্থাৎ পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিই আপনাকে জিতিয়ে দিয়েছে। যেখানে এত দারিদ্র্য, সেখানে জামা-জুতো-সাইকেল বিলি করলে ভোট তো মিলবেই। দারিদ্র্য কমানোই নেতার কাজ। গরিবের জন্য টাকা খরচ করে যদি সে কাজটা হয়, তাহলে সে তো ভাল রাজনীতি। ভোটের বাক্সে তার পুরস্কার মেলাই উচিত। কিন্তু গরিবকে সামনে রেখে টাকা খরচ করলেই যে সে টাকা দারিদ্র্য কমাবে, এমন তো নয়। আপনি সাড়ে সাত হাজার ক্লাবকে বছরে একশো কোটি টাকারও বেশি দিচ্ছেন। তাতে গরিবের কী? মাটি উৎসবে কৃষির জন্য বরাদ্দ কেন্দ্রের টাকা খরচ হয়েছে। প্রান্তিক চাষির কী লাভ হয়েছে? মেলা-খেলা, ক্রিকেট তারকাদের সোনার গয়না, বিজ্ঞাপনে আপনার ইচ্ছা-উদ্যোগের প্রচার— কোনোটাতেই গরিবের লাভ হওয়ার কথা নয়। এগুলো নিঃসন্দেহে চটকদারিতে লোককে খুশি করে ভোট টানার চেষ্টা। এসব আমার কথা নয়। লোকে বলছে। হিংসায় বলছে।

এছাড়াও লোকে অনেক কথা বলছে। তাদের দাবি, কেন্দ্রের খাদ্য নিরাপত্তা আইনের সঙ্গে রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্প জুড়ে দিয়েছেন মমতা। রাজ্যের ন' কোটি মানুষের প্রায় সাড়ে সাত কোটি সুলভ চাল-গমের আওতায় আসছেন। যদিও এঁরা সবাই হয়তো গরিব নন। অন্য দিকে, দারিদ্র্য কমাতে যে কাজগুলো না করলেই নয়, তেমন কিছু কাজে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে বলে সবাই বলছে।

এ রাজ্যে স্কুলছুটের হার এখন ভয়াবহ। ২০০৬ সালে ২৩ লক্ষ ৮৮ হাজার পড়ুয়া ছিল প্রথম শ্রেণীতে। ২০১৬ সালে মাধ্যমিক দিয়েছে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার। অর্থাৎ মোটা হিসেবে, প্রায় অর্ধেক পড়ুয়া স্কুল শেষ করেনি। শাসকরা বলতে পারেন, এই দশ বছরের অনেকটাই ছিল বাম আমল। প্রাথমিকেই যারা স্কুল ছেড়েছে, তাদের দায়টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। কিন্তু সে সান্ত্বনাও নেই। জেলাওয়াড়ি হিসেব বলছে, এই আমলে প্রাথমিকে স্কুলছুটের হার বেড়েছে। ২০০৭-০৮ সালে যারা ছিল প্রথম শ্রেণীতে, চতুর্থ শ্রেণীতে (২০১০-১১) তাদের ২০ শতাংশ স্কুলছুট হয়েছিল। আর ২০১১-১২ সালে যারা প্রথম শ্রেণীতে, চতুর্থ শ্রেণীতে (২০১৪-১৫) তাদের ২৬ শতাংশ স্কুলছুট। লক্ষণীয়, শিক্ষার অধিকার আইন পাশ হওয়ায় স্কুল পরিকাঠামোর জন্য অনেক বেশি টাকা বরাদ্দ হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। ২০০৬ সালের তুলনায় এখন কেবল প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ক্লাসঘরের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ, শিক্ষক বেড়েছে অন্তত ৭০ হাজার। তা সত্ত্বেও কেন স্কুলছুটের হার বাড়ছে? প্রশ্নটা নিয়ে সম্ভবত সরকারেরও অস্বস্তি আছে—গত তিন বছর 'ইকনমিক রিভিউ'-তে শুধু 'এনরোলমেন্ট'-এর পরিসংখ্যান মিলছে, 'ড্রপ- আউট'-এর উল্লেখই থাকছে না।

শিক্ষায় মমতার দুটি প্রকল্প 'কন্যাশ্রী' ও 'সবুজসাথী'। দুটোরই লক্ষ্য উঁচু শ্রেণীর পড়ুয়া, যা গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মতো দাঁড়াচ্ছে। আর এক সমস্যা, কন্যাশ্রীর টার্গেট মেয়েরা। কিন্তু এ রাজ্যে স্কুলছুট ছেলেরাই বেশি। মাধ্যমিকের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট। সেরা জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে এ বছর মেয়েদের চাইতে ছেলে পাঁচ হাজার কম। মুর্শিদাবাদে ব্যবধান দশ হাজার। ব্যবধান প্রতি বছর বাড়ছে, বলছে সরকারি তথ্য। গরিবের প্রয়োজনের সঙ্গে প্রকল্প খাপ খাচ্ছে না। অথচ গরিবের শিশু স্কুলছুট হওয়া মানে দারিদ্র্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আর দু'টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই গরিবের সঙ্গে পয়সাওয়ালাদেরও পাইয়ে দেওয়ার নীতি নিয়েছেন মমতা।

সবার কথা শুনে আমার মনেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠছে, দিদি, আপনি কি আসলে জনগণের পয়সায় জনগণের ভোট কিনে জিতলেন?

— **সুন্দর মৌলিক**

ছাবাহার—মোদীর উষ্ণীষে আর একটি উজ্জ্বল পালক

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উষ্ণীষে আরও একটি উজ্জ্বল পালক সংযুক্ত হলো—ইরানের সঙ্গে ছাবাহার বন্দর চুক্তি।

দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক প্রয়াস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম ইরান সফরে সফলতা লাভ করল। ছাবাহারই প্রথম বিদেশি বন্দর যেখানে ভারত একটি মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করতে চলেছে। এই বিনিয়োগ ভারতের বাণিজ্যিক ও কৌশলগত উভয়দিক থেকেই অত্যন্ত

(বাঁ দিক থেকে) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি এবং আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ ঘানি। তেহরানে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর।

গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই চুক্তির ফলে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আবার, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে সরাসরি আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা থাকার জন্য এই দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা যায়নি। পাকিস্তান ভৌগোলিক অবস্থানকে কৌশলগত কাজে লাগিয়ে আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সামগ্রী পরিবহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এতদিন আফগানিস্তানে কোনো মালপত্র পাঠাতে হলে ভারতকে পাকিস্তানের নিকট হতে ট্রানজিটের অনুমতি নিতে হোত। সেই অনুমতি দিতে পাকিস্তান প্রায়শই অস্বীকার করত। এই চুক্তির ফলে আফগানিস্তান, ইরান প্রভৃতির সঙ্গে সরাসরি নৌ-সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে; ফলে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে ভারত বিপুল সাহায্য করছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিবহণে পাকিস্তান তার ভূখণ্ড ও আকাশসীমা ভারতকে ব্যবহার করতে দেয়নি। কারণ, তারা চায়নি আফগানিস্তান সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক, ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক দৃঢ় হোক। পাকিস্তান চিরকাল এই শয়তানি করে এসেছে। শয়তানি করা তার স্বভাব। তাই প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ইরানের মধ্য দিয়ে ভারতকে আফগানিস্তানে পাঠাতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে ভারত পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান পর্যন্ত একটি বাণিজ্যিক পথ তৈরি করতে চেয়েছিল। শুধু আফগানিস্তান নয়, এই বাণিজ্যপথে মধ্য এশিয়ার সঙ্গেও বাণিজ্য বাড়াতে চায় ভারত। তাই শুধু ছাবাহার বন্দর নয়, ভারত সেখান থেকে পাঁচশো কিলোমিটার রেললাইন বসাবার পরিকল্পনাও করেছে। সেই লাইন ইরানের জাহেরান পর্যন্ত যাবে। ছাবাহার বন্দর চালু করতে পারলে পাকিস্তানকে কাঁচকলা দেখিয়ে আমরা মধ্য প্রাচ্য পর্যন্ত ব্যবসা করতে পারবো। ছাবাহারের মাধ্যমে ভারতীয় জাহাজ সরাসরি ইরান উপকূলে পৌঁছবে। বাণিজ্যের দৃষ্টিতে ছাবাহার বন্দরের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় জাহাজ ও ভূতল পরিবহণমন্ত্রী নীতীন গডকড়ির কথানুযায়ী দিল্লী ও মুম্বই-য়ের মধ্যে যে দূরত্ব তদপেক্ষা কম দূরত্ব কান্দলা (গুজরাটের কচ্ছে) ও ছাবাহারের মধ্যে।

ছাবাহারকে কেন্দ্র করে ফ্রি ট্রেড জোনের মাধ্যমে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হতে পারে। ছাবাহার চালু হলে ভারতীয় বিনিয়োগের নয়া গন্তব্য হবে ইরান-সহ মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ। ভারত ও ইরানের এই চুক্তিকে আমেরিকা স্বাগত জানিয়েছে। কারণ এর মধ্যে আমেরিকার স্বার্থও জড়িত। আফগানিস্তানে মোতায়েন মার্কিন সেনার কাছে বিভিন্ন সামগ্রী পৌছোবার রাস্তা পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে রয়েছে। পাকিস্তান সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকার কাছ থেকে বহু অর্থ নিয়েছে। এখন পাকিস্তানের সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু আমেরিকা নয়, আফগানিস্তানকেও এর জন্য পাকিস্তানের হাতে-পায়ে ধরতে হয়। এই চুক্তির ফলে আফগানিস্তানেরও স্বস্তি ফিরবে। এই চুক্তির দ্বিতীয় গুরুত্ব হলো, গোয়াদর বন্দরে চীনকে টক্কর দেওয়া। পাকিস্তানের গোয়াদরে বন্দর তৈরি করে চীন ভারতকে পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছে। এই গোয়াদর

বন্দর থেকে ছাবাহারের দূরত্ব মাত্র ৭২ কিলোমিটার। চীনা বন্দর তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইরানের ছাবাহারে ভারত তার উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার কাজ শুরু করলেও তা শম্বুক গতিতে চলছিল। ইরানের বিতর্কিত পরমাণু কর্মসূচি রুখে দেবার জন্য আন্তর্জাতিক মহল বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করে। গত বছরের শেষ দিকে ইরান পরমাণু কর্মসূচিতে রাশ টানায় তাদের উপর থেকে সেই নিষেধাজ্ঞাও উঠে যায়। সুযোগ বুঝে মোদী অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে গত ২৩ মে এই ছাবাহার চুক্তি সম্পাদন করেন। মোদীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করতে হবে। কারণ, ইরানের বিতর্কিত পরমাণু কর্মসূচি থামিয়ে দেবার জন্য আমেরিকা-সহ ইউরোপের দেশগুলি ইরানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার ভোটে তৎকালীন ভারত সরকার ইরানের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ফলে, দুই দেশের সম্পর্কও ধাক্কা খায়। ফলে ছাবাহার বন্দর প্রকল্পও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। পরিস্থিতি এমন হয় যে, এই প্রকল্প প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদী হাল ধরেন। তাঁরই উদ্যোগে মূলত এই চুক্তি সাফল্য লাভ করে। ছাবাহারে বন্দর করে ভারত চীনকে টক্কর দেবার পথ খুলে রাখে। এটা চীন পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের (সিপিইসি) পাল্টা চাল। পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দরের সঙ্গে চীনের উত্তর-পশ্চিম জিনজিয়াং অঞ্চলের যোগাযোগ এই করিডোরের মাধ্যমে স্থাপিত হবে। ভারত এই করিডোরের বিরোধিতা করেছে। কারণ এটা পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে। অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে এখনও বিবাদ মেটেনি। যা হোক গোয়াদর বন্দরে চীন ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। ভারত ছাবাহারে ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। সুতরাং ছাবাহারে বসে ভারত চীনের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলবে।

এই চুক্তি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী ও ইরানের রাষ্ট্রপতি হাসান রৌহানি এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক চুক্তি বলেছেন। সেখানে মোদী বলেন— 'ভারত ও ইরান নতুন বন্ধু নয়, আমাদের বন্ধুত্ব ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন।' হাসান রৌহানি বলেন— 'ইরান ও ভারতের পারস্পরিক সহযোগিতার একটি বড় প্রতীক হবে ছাবাহার।' এই চুক্তিতে আরও কয়েকটি বিষয় আছে। সেই বিষয়গুলিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন সন্ত্রাসবাদ দমনে ইরান ও ভারত যৌথভাবে কাজ করবে। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত গোপন তথ্য আদান-প্রদান করবে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার দিক দিয়ে বিচার করলে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে পাকিস্তানের মতো জঙ্গিপোষণকারী দেশগুলির মাথাব্যথা বাড়বে।

বিগত বছরে রাশিয়ার উফা শহরে মোদী ও রৌহানি পৃথক বৈঠক করেন। তখনই দুই দেশের মধ্যে ঝুলে থাকা বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত সমাধান সূত্র বের করার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। বিগত এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, বিদেশসচিব এস. জয়শঙ্কর, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, সড়ক পরিবহণ ও জাহাজমন্ত্রী নীতীন গডকড়ি, পেট্রোলিয়ম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সকলেই এই কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং তারই সুফল এই ঐতিহাসিক চুক্তি। ওই একই দিনে বিকালে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী, ইরানের রাষ্ট্রপতি রৌহানি এবং আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি আশরাফ ঘানি। এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তিন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মোদী যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, তাতে ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এছাড়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে মোদী যেভাবে সম্পর্ক গড়েছেন, তাতে শত্রুদেশ এবং ঘরশত্রুদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠছে। তারা প্রমাদ গুনছেন এবং প্রমাদ বকছেন। মোদী 'চোখের-বালি' হয়ে উঠছে। তাই তারা মোদীর বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশের বিরোধিতা করছে।

একথা ভুললে চলবে না, ইরানের পরেই ভারতে সর্বাধিক শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান বসবাস করেন। সুতরাং ইরানের সঙ্গে ভারতের সর্বদা সম্প্রীতি বজায় রেখে চলা উচিত। তবেই ভারতীয় শিয়া মুসলমানদের প্রতি সুবিচার সহমর্মিতা দেখানো হয়। এই চুক্তি প্রকারান্তরে এই উদ্দেশ্যও সফল করেছে। তাছাড়া আগামী দিনের বিশ্ব অর্থনীতিতে ইরান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে। কারণ তার পরমাণু গবেষণা এবং তেল-ভাণ্ডার। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেল ভাণ্ডারের অধিকারী এই ইরান। সুতরাং ভারতের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন চুক্তি পরবর্তীকালে ভারতকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করবে।

নরেন্দ্র মোদী এই সত্যটি বুঝতে পেরেছেন। এটা তাঁর দূরদৃষ্টি। তিনি এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করলেন। কিন্তু এই কাজে দেশের ঘরশত্রুরা চুপ করে গেছে। আর সমস্ত মিডিয়া নীরব রয়েছে। তারা যে গুরুত্ব নিয়ে রোহিত ভেমুলা, কানহাইয়া কুমারদের 'হাইলাইট' করেছিল তার লক্ষাংশের এক অংশ নিয়ে এই ঐতিহাসিক চুক্তির কথা বলেনি। কারণ তারা মনে মনে এই গরিব চা-ওয়ালা প্রধানমন্ত্রীকে সহ্য করতে পারেনি। তাঁর প্রতিভা, দক্ষতা প্রভৃতি দেখেও দেখেনি। সংবাদমাধ্যম যদি তার কর্তব্য ছেড়ে শাসক দলের প্রতিপক্ষ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তাকেও জনগণের চপেটাঘাত খেতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নির্বাচন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটি সংবাদমাধ্যম, লাগাতার শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করে তাকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে সাহায্য করেছে। তাই, সংবাদমাধ্যমের উচিত নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করে জনসাধারণকে সঠিক পথে সদর্থক দিকে পরিচালিত করা। সংবাদমাধ্যমের কখনোই কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে অহেতুক আলোচনা করা অনুচিত। এর ফলে তার দায়িত্বজ্ঞানের ঘাটতিই প্রতিপাদিত হয়।

আর্য আক্রমণ তত্ত্ব ও চিন্তাবিকৃতি

প্রবাল চক্রবর্তী

গল্পের গোরু গাছে চড়ুক, আপত্তি নেই তাতে। কিন্তু লোকে যদি সেই গল্পকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে ফেলে, তাহলেই হয় মুশকিল। ইংরেজ আমলে এরকমই এক গল্পের গোরুকে গাছে চড়ানো হয়েছিল। আজও তাকে নামানো যায়নি গাছ থেকে।

সেটা ছিল উপনিবেশবাদের যুগ। জাহাজে চড়ে ইউরোপীয়রা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সর্বত্র আদিম ভূখণ্ডের আদিম অধিবাসীদের মেরেকেটে তাদের সভ্যতাকে বিলুপ্ত করে সেসব দেশের মালিক হয়ে বসেছে। নিজেদের অপরাধবোধকে প্রবোধ দেবার জন্য তারা এক থিওরি খাড়া করল। বলল, সাদা চামড়ার মানুষরা হলো উন্নত রক্তের প্রাণী। মানবসভ্যতাকে উৎকর্ষের রাস্তায় নিয়ে যেতে হলে পৃথিবীজুড়ে সেই উন্নত রক্তের মানবগোষ্ঠীরই রাজত্ব কায়েম করতে হবে। অনুন্নত রক্তের মানবগোষ্ঠীগুলোকে বিলুপ্ত করে দিতে হবে। সেটাই ইউরোপীয়দের বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য।

ভারতবর্ষে এসে তাদের এই ফর্মুলা কাজে এল না। ভারতের অধিবাসীরা মোটেই অসভ্য নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, দর্শন, ধনসম্পদ— সবকিছুতেই তারা ইউরোপীয়দের থেকে এগিয়ে। প্রশ্ন জাগলো, ভারতীয়রা শ্বেতবর্ণের না হয়েও এত উন্নতি করল কীভাবে? ভারতবর্ষই প্রথম দেশ, যেখানে শাসনক্ষমতা দখল করেও ইউরোপীয়রা স্থানীয় অধিবাসীদের মুছে ফেলতে পারলো না। কী করা যায়? এ তো উন্নত রক্তের তত্ত্বটাকেই বানচাল করে দেবে! আরো বড় সমস্যা দেখা দিল ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে। ইংরেজদের ভারত-শাসনের আত্মবিশ্বাস চূর্ণ হয়ে গেল সেই সংগ্রামের তীব্রতায়। প্রাচীন উন্নত সভ্যতার গৌরবে গর্বিত ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় সমাজের সামনে ইংরেজদের শক্তি যে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে, সেটা উপলব্ধি করল তারা। তাই অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করলো 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব'।

ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা বললেন, ভারত একজাতি নয়। ভারতে দু'ধরনের জনগোষ্ঠী আছে— আর্য ও অনার্য। তিন হাজার বছর আগে শ্বেতাঙ্গ আর্যরা ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছিল। তখন ভারতের কৃষ্ণাঙ্গ অনার্য অধিবাসীরা নিজেদের অসুর, দৈত্য বা দানব বলত। আর্যরা তাদের পরাজিত করে দক্ষিণ ভারতে খেদিয়ে দিয়েছিল, অসভ্য ছিল তারা, গ্রামে থাকতো। অনার্যরা ছিল সভ্য, তারা সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করেছিল। ভারতের তথাকথিত নীচুজাতের লোকেরা অনার্যদের বংশধর, উঁচুজাতের লোকেরা আর্যদের। হিন্দুদের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ— বেদ, সাংখ্য, গীতা, চণ্ডী সবই আর্যদের রচনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা— সবাই আর্য আক্রমণের নেতা-নেত্রী।

আর্য আক্রমণ তত্ত্ব এক ঝটকায় ভারতের দেশজ সংস্কৃতিকে বহিরাগত বানিয়ে দিল। উত্তর ভারত বনাম দক্ষিণ ভারত, উঁচুজাত বনাম নীচুজাত; দেশজ হিন্দু সমাজকে এমন শত যুযুধান সমাজে বিভক্ত করে দিল। তার সঙ্গে এটাও বলে দিল, যেহেতু এ দেশটাকে শ্বেতাঙ্গ আর্যরা আগেও পদানত করেছে এবং সেটাকে মেনে নিয়েছিল ভারতবাসী, সেহেতু ইংরেজদের এদেশের ওপর অধিকারকেও সব ভারতবাসীর নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া উচিত। আরো বলল, প্রাচীনকালে আর্য আক্রমণের ফলে ভারতীয় সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল, ইংরেজ আক্রমণের ফলেও সেটাই আবার হবে। তাই ইংরেজ শাসনেই ভারতের মঙ্গল। তাছাড়া, হিন্দুরা নিজেরাই যখন বহিরাগত, তখন তারা অন্য বহিরাগতদের 'বহিরাগত' বলে কোন মুখে?

ভারতীয় জাত্যভিমানের শিরদাঁড়া ভেঙে দিল আর্য আক্রমণ তত্ত্ব। সেসময় ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও দেশনেতাদের উচিত ছিল এই চক্রান্তের পর্দাফাঁস করা। কিন্তু আর্য আক্রমণের তত্ত্বকে এত বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল যে, এতবড় মিথ্যেটাকই তাবৎ দেশবাসী সত্যি বলে বিশ্বাস করে ফেললো। এমনকী স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও চিরস্থায়ীভাবে ঢুকে গেল এই ভুল তত্ত্ব। আমাদের মনেও জেঁকে বসল ভুল একটা ধারণা। তারই ফল, নিজেদের সমাজটাকে আজ আর আমরা একজাতি একরক্ত ভাবতে পারি না। ভারত দেশটাকে, মানে এই ভাগীরথী, এই নর্মদা, এই সুন্দরবন, এই বিন্ধ্যপর্বতকে আমরা আমাদের সভ্যতার উৎস বলে মানতে পারি না। বারবার সভ্যতার উৎসের খোঁজে আমাদের হিমালয় টপকাতে হয়। কোনো যুক্তি, কোনো কারণ ছাড়াই। চিন্তার বিকৃতি এমন জায়গায় এসেছে, আজ যদি তাজিকিস্তানে সিংহবাহিনীর মূর্তি পাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ আমরা ভেবে বসি, দুর্গাপুজোর পরম্পরা নিশ্চয়ই তাজিকিস্তান থেকে এসেছে। জার্মানিতে নৃসিংহ-মূর্তি পাওয়া গেলে মনে করি, নৃসিংহ-অবতারের কাহিনি নিশ্চয়ই জার্মানি থেকে আমদানি হয়েছে। ইউরোপে স্বস্তিকাচিহ্নের ব্যবহার দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, নিশ্চয়ই আমাদের সভ্যতা ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছে। উল্টোটা কেন ভাবতে পারি না আমরা? কারণ, মনে মনে আমরা আর্য আক্রমণের তত্ত্বকে বিশ্বাস করে বসে আছি।

বেদ প্রাচীনযুগের দার্শনিক উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু কোন সে সভ্যতা সেই দার্শনিক উপলব্ধির পৃষ্ঠভূমি, সেটা ঐতিহাসিকরা খুঁজে পান না। উল্টোদিকে হরপ্পাসভ্যতা প্রাচীনযুগের প্রযুক্তি ও নগরসভ্যতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু তাদের লিখিত কোনো কাব্য বা দর্শন ঐতিহাসিকরা খুঁজে পান না। তারপরেও ঐতিহাসিকরা বলেন— বেদ অসভ্য আর্যদের রচনা, তারা নদীর তীরে কুটির বানিয়ে থাকতো।

সিন্ধুসভ্যতা অনার্যদের তৈরি। তারা শহর বানিয়েছে, কিন্তু কোনো সাহিত্য রচনা করেনি। এদিকে আর্যরা পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র রচনা করেছে, ওদিকে অনার্য সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহরে যোগীর ছবি। গোটা ব্যাপারটাই কী স্ববিরোধী নয়? এই সম্ভাবনাটার কথা কেন মাথায় আসে না, হরপ্পা সভ্যতার মানুষগুলোই বেদ রচনা করেছিল? আর সে সভ্যতা তো শুধু সিন্ধুপাড়ের সভ্যতা নয়। সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা থেকে কাবেরী, শহর থেকে গ্রাম, পাহাড় থেকে জঙ্গল, পুরোটাই তো সেই একই সভ্যতা। এমনটা ভাবতে আপত্তি কোথায়? যারা ভারতের জঙ্গলে থাকে, পাহাড়ে থাকে, তাদের কেন আমরা আমাদের জ্ঞাতি, আমাদের রক্ত ভাবতে পারি না?

ছোটোবেলার একটা স্মৃতি খুব মনে পড়ে। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরঘরে সুর করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অথবা কাশীদাসী মহাভারত পড়তেন ঠাকুরমা, তাঁর পাশে বসে শুনতাম। রাতে রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রগুলো নিয়েই স্বপ্ন দেখতাম। একটু বড় হতে হাতে এল অবন ঠাকুরের রাজকাহিনি ও শরদিন্দুর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো। সবার অজান্তেই সেগুলো একটা রক্ষাকবচ তৈরি করে দিয়েছিল মনের ভেতরে। সেসময় একটা বই পড়েছিলাম, হিন্দিতে লিখিত রাহুল সংস্কৃত্যায়নের 'ভলগা সে গঙ্গা'-র বঙ্গানুবাদ। বইটা শুরু হচ্ছে ভলগার তীরে মানবসভ্যতার সূত্রপাত ও আদিম আর্যজাতির জীবনযাত্রা দিয়ে। গল্প এগোচ্ছে সেই বর্বর আর্যজাতির রাশিয়া ছেড়ে পামির গ্রন্থি বেয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ দিয়ে। শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইংরেজ রাজত্বের পটভূমিকায় ভারতে এক ব্রাহ্মণ ও এক শূদ্রের সংঘাত দিয়ে, যেখানে শূদ্র ব্যক্তিটি ইংরেজের স্বপক্ষে যুদ্ধ করতে চায়, যাতে সে সভ্যতার পিতৃভূমি রাশিয়াকে বাঁচাতে পারে। বইটা কচি মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যিনি আমাকে বইটা দিয়েছিলেন, তাঁর হয়তো সেরকমই কিছু উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কেন? হয়তো সেই রক্ষাকবচেরই জন্য। কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হয় না, বইটা কত ভারতীয়কে নিজের দেশের বিরুদ্ধে, নিজের ভাইবোনেদের বিরুদ্ধে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষে দাঁড়াতে প্ররোচিত করেছে।

আজ যদি তাজিকিস্তানে সিংহবাহিনীর মূর্তি পাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ আমরা ভেবে বসি, দুর্গাপুজোর পরম্পরা নিশ্চয়ই তাজিকিস্তান থেকে এসেছে। জার্মানিতে নৃসিংহ-মূর্তি পাওয়া গেলে মনে করি, নৃসিংহ-অবতারের কাহিনি নিশ্চয়ই জার্মানি থেকে আমদানি হয়েছে। ইউরোপে স্বস্তিকাচিহ্নের ব্যবহার দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, নিশ্চয়ই আমাদের সভ্যতা ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছে। উল্টোটা কেন ভাবতে পারি না আমরা? কারণ, মনে মনে আমরা আর্য আক্রমণের তত্ত্বকে বিশ্বাস করে বসে আছি।

পাঠ্যপুস্তকে আছে, আর্যজাতির প্রাচীন বাসভূমি মধ্য এশিয়া। হিটলারের সমকালীন জার্মানরা বলত, আর্যজাতির আদি বাসভূমি জার্মানি। রাহুল সংস্কৃত্যায়ন তবে কেন আগ বাড়িয়ে বললেন, আর্যজাতির প্রাচীন বাসভূমি ভলগার তীর? কোনো পপুলার থিওরিতেই তো সেটা বলছে না! খটকা লেগেছিল। ভলগার ওপর এত জোর কেন রাহুলের? জেনেছিলাম, রাহুল সোভিয়েত-ঘেঁষা কমিউনিস্ট ছিলেন। তবে কি সেই আনুগত্য থেকেই বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে ভলগার তীরকে সভ্যতার সূতিকাগৃহ প্রমাণ করার চেষ্টা? যাতে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়, যে-কোনো চিন্তাধারা যেটা ভলগার তীরে জন্মেছে, সেটাই মানবসভ্যতার অগ্রগতির জন্য বৈপ্লবিক?

পুরো বইটাই কি সোভিয়েত মডেলের বিশ্ববিপ্লবকে গেলানোর জন্য লেখা? আর্য আক্রমণ দিয়ে সোভিয়েত লালফৌজের ভবিষ্যতের ভারত-আক্রমণের পরিকল্পনার স্বপক্ষে জনমত তৈরি করা? যার একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে, তাকে কি আর বিশ্বাস করা যায়?

পরে জেনেছি, আর্য আক্রমণের থিওরি অজস্র স্ববিরোধিতায় ভরা। জেনেটিক স্টাডি প্রমাণ করেছে, গত দশ হাজার বছরে ভারতীয় বংশাণুর মধ্যে বড়সড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। বহিরাগত আর্যদের বংশাণু কি তবে বেমালুম উবে গেল? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা— সবাই নাকি আর্য আক্রমণের নেতা-নেত্রী। অথচ পুরাণেই আছে, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বহুবার অসুরদের

তপস্যায় খুশি হয়ে তাদের ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সব বর দিয়েছেন। কোনো আক্রমণকারী কি নিজের ঘৃণিত জাতশত্রুকে এরকম বর দেয়? ঋগ্বেদের ১.৩৫.১০ সূক্ত 'হিরণ্যহস্ত অসুরঃ সুনীথঃ' বলছে, হে সোনালি হাতের অসুর, দয়ালু নেতা, আমাদের সহায় হও। যে আর্যরা কৃষ্ণাঙ্গ অসুরদের ঘৃণা করেছে, পরাভূত করেছে, নিজেদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে তাদের হিরণ্যহস্ত দয়ালু নেতা বলে সম্বোধন করছে— এটা কীভাবে সম্ভব হয়?

হিন্দুদের কোনো ধর্মগ্রন্থে কি আর্যদের ভারত-বহির্ভূত আদি বাসস্থান, তাদের ভারত আক্রমণ ও তাকে কেন্দ্র করে অনার্যদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের কথা লেখা আছে? কোথাও তা নেই! আড়াই হাজার বছর আগে তামিল কবি এলাঙ্গো আদিগল তাঁর কাব্যগ্রন্থ শিলাপঠিকরমে তামিল বনবাসীদের মধ্যে প্রচলিত দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের যে কাহিনি বিবৃত করেছেন, তা আমাদের জানা কাহিনি থেকে আলাদা নয়। যদি তামিলরা অনার্য হয়ে থাকে, আর যদি মা দুর্গা আর্যদের প্রতিভূ হয়ে অনার্য রাজা মহিষাসুরকে ছলনার দ্বারা হত্যা করে থাকেন, তবে সেই কাব্যগ্রন্থে কেন লেখা নেই মা দুর্গার ছলনার কথা, যেটা নাকি সেই কাব্যগ্রন্থ রচনার মাত্র পাঁচশো' বছর আগে ঘটেছিল?

ছোটবেলায় কমিক্সে দেখেছি, অসুরদের রং কালো, বিরাট গোঁফ, কালো কোঁকড়া চুল, নগ্নগাত্র। দেবতাদের গোঁফ নেই, ফর্সা রং, সোজা চুল, গায়ে উত্তরীয় ও গয়নাগাটি। অসুরদের সঙ্গে ভারতের বনবাসীদের মিল, দেবতাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের মিল, এমনটা কেন আঁকা হোত? দেবাসুরের এরকম বর্ণনার কোনো পৌরাণিক প্রমাণ কোথাও খুঁজে পাইনি। বস্তুত, দেবাসুরের মধ্যে চেহারার আদৌ কোনো আইডেনটিফাইং ডিফারেন্স ছিল, এরকম প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিব, বিষ্ণু, কালী ঘোরবর্ণের ছিলেন। যম, শনি আদি অনেক দেবতা কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন। তাঁরা তবে কীভাবে তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ আর্য হন?

অন্যদিকে, দৈত্য 'হিরণ্যকশিপু'-র কথা নিশ্চয়ই জানেন। 'হিরণ্যকেশ' মানে 'সোনালী চুল'। অসুর হিরণ্যকশিপুর চুল সোনালি ছিল! তার মানে অসুররা কৃষ্ণাঙ্গ অনার্য নয়?

পুরাণেই বলছে, দেবতা দৈত্য দানব— সবাই একই বংশের সন্তান। এদের সবার পিতা কশ্যপ মুনি। মুনিপত্নী দিতি, অদিতি ও দনু— তিনজনই রাজা দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে। দিতির সন্তান দৈত্য, অদিতির সন্তান আদিত্য (দেবতাদের নেতা), দনুর সন্তান দানব। তাই দেবাসুর- দ্বন্দ্বের রেসিয়াল ব্যাখ্যাটা ধোপে টেকে না। এরা সবাই ভারতীয়, কেউ বাইরে থেকে আসেনি।

দেবাসুর ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হলে পারসিক সভ্যতাকে বুঝতে হবে। ওরা ঠিক যেন হিন্দু-সভ্যতার আয়না-যমজ। পারসিকদের ধর্মগ্রন্থগুলো (জেন্দাভেস্তা ও প্রাক-জরথুষ্ট্রীয় 'গাথা'গুলো)-তে 'দেব' শব্দটা অনিষ্টকারী অর্থে ব্যবহার হয়েছে, 'অসুর' শব্দটা শুভশক্তি অর্থে। মজার ব্যাপার, তাই না? পারসিক রাজাদের উপাধি হোত 'অসুর'--- অসুরবাণীপাল, অসুরনাসিরপাল। ঠিক যেমন ভারতীয় রাজাদের উপাধি হোত 'দেব'— শশাঙ্কদেব, মানবদেব।

তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে? ভারতে দেবতারা ভালো, অসুররা খারাপ; পারস্যে অসুররা ভালো, দেবতারা খারাপ। এই সত্যিটা মাথায় রেখে যদি দেবাসুর-দ্বন্দ্বের রেসিয়াল ব্যাখ্যাটা মানতে হয়, তবে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ায়? অসুররা ছিল পারস্যের অধিবাসী, তারা ভারত আক্রমণ করেছিল। দেবতারা ছিল ভারতের আদিম অধিবাসী, যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল, বহিরাগত আক্রমণকারী অসুরদের প্রতিহত করেছিল। তাই দাঁড়ায় কি না? ব্যাপারটা অতটাও সরল নয়, তবে এই একটি সত্যই 'অসুর আদিবাসী' থিওরিটাকে যমালয়ে পাঠাতে পারে।

আর্য আক্রমণের তত্ত্বের পেছনে এমন কোনো প্রমাণ আজ আর অবশিষ্ট নেই, যেটা ভুল প্রমাণিত হয়নি। তাই আজ আর্য আক্রমণের তত্ত্ব একটি গল্পবিশেষ। যারা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে তারা কুযুক্তি দেয়, যদি আর্য আক্রমণ না ঘটে থাকে তা হলে দেবাসুর-দ্বন্দ্বের এই যে এত পৌরাণিক কাহিনি আছে সেগুলো আসলে কী? তাদের বলতে চাই, আর্য আক্রমণের তত্ত্বকে বাদ দিলে তবেই দেবাসুর-দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 'অসুর' কোনো জাতি নয়, একটা মতবাদ। অসু-বাদ সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম একেশ্বরবাদ। 'অসু বিনে উপাস্য নেই'— এ কথার প্রতিধ্বনি আজও শোনা যায় পারসিকদের ধর্মগ্রন্থে। সেই মতের প্রবক্তা ছিল দৈত্য ও দানব। 'দেবতা'-ও কোনো জাতি নয়, মতবাদ। যার অবস্থান একেশ্বরবাদী অসুবাদের ঠিক বিপরীতে। অসুবাদের মূল শত্রু ছিল ভারতের প্রাচীন প্রকৃতিপূজার পরম্পরা। 'দেবতা' হলো সেই পরম্পরার বাহক— অগ্নি, বজ্র, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক প্রান্তিক উপজাতিদের সামূহিক নাম। যাদেরকে সংগঠিত করেছিল দৈত্য-দানবদেরই বৈমাত্রেয় ভাই আদিত্য।

মহাভারতের যুদ্ধের সঙ্গে দেবাসুর-দ্বন্দ্বের অনেক মিল। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ— এক ভাই সত্যের পক্ষে, অন্য ভাই অসত্যের। মহাভারতের যুদ্ধের মতোই দেবাসুর- দ্বন্দ্বও রেসিয়াল কনফ্লিক্ট নয়, মতাদর্শের লড়াই। দেবাসুর-দ্বন্দ্ব ছিল মানব-ইতিহাসের প্রথম ডিক্টেটোরিয়াল মোনোথিইজমের সঙ্গে উপাসনা-পদ্ধতির স্বাধীনতার লড়াই। নাগরিক সভ্যতার বুলডোজারের বিরুদ্ধে গরিব মানুষের, প্রান্তিক উপজাতিদের অধিকার-প্রতিষ্ঠার লড়াই।

মহান এই ভারতসভ্যতা হিমালয়ের অপর পারে জাত নয়। হিমালয় ও সমুদ্রে ঘেরা এই কাদামাটিতেই জন্মেছে আমাদের সভ্যতা, এই রোদজলে খেলেই পুষ্ট হয়েছে সে। বীরসা মুণ্ডা থেকে শ্রীনিবাস রামানুজম্, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা থেকে অরবিন্দ ঘোষ, সবার ধমনীতে বইছে একই রক্ত। আর সেটাকেই ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল আর্য আক্রমণ তত্ত্ব দিয়ে। ■

ফ্যারাওদেরও আগে

নলিন মেহতা

কোনো বিষয়ে আলোড়ন তৈরি করতে গেলে বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন মানুষেরা প্রায়শই উপকারে আসেন। যেমন ১৯৯৭ সালে প্রকাশ্যে আসা ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম গড়াপেটা কেলেঙ্কারির কথাই ধরা যাক, যা কোনো ক্রীড়া সাংবাদিকের মাধ্যমে নয়, রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের দ্বারাই উন্মোচিত হয়েছিল। যাঁরা প্রতারক ক্রিকেটারদের সম্পর্কে দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখেছিলেন। একইভাবে বরঞ্চ বেশি করে, আই আই টি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) খড়্গপুরের আর্থিক অনুদানে পরিচালিত একটি গবেষণায় এক ছাতার নীচে এসেছেন চারটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ভূতত্ত্ববিদ, প্রত্নবিজ্ঞানী ও পদার্থবিদরা। যাঁরা অধুনালুপ্ত এ এস আই (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া)— প্রত্নতত্ত্ববিদদের উৎখননের কাজটি করছেন। এঁদের গবেষণায় উঠে এসেছে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা অন্তত আট হাজার বছরের পুরোনো, ইতিপূর্বে যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে পাঁচ হাজার বছরে পুরোনো সেটি সঠিক নয়।

গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উচ্চমার্গীয় বিজ্ঞান পত্রিকা— নেচার-এ। প্রাচীন মৃৎশিল্পের ভগ্নাংশের ওপর 'দৃশ্যত উদ্দীপিত আলোক-বিচ্ছুরণ' (অপটিক্যালি স্টিমুলেটেড লিউসিন সেস) পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা সঠিক হলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সূচনাকালটি বস্তুত পিছিয়ে যেতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রমাণ করছে নীল নদের উপত্যকায় মিশরের ফ্যারাও (৭০০০— ৩০০০ খৃ.পূ.) কিংবা টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস উপত্যকায় মেসোপটেমিয় সভ্যতা (৬৫০০—৩১০০ খৃ.পূ.)-র থেকেও এর মূল আরও গভীরে প্রোথিত।

গবেষকরা একই সঙ্গে হরপ্পা-পূর্ব সভ্যতার নিদর্শনও পেয়েছেন, যার অস্তিত্ব ছিল এর থেকেও অন্তত হাজার বছর আগে। যা তথাকথিত 'সভ্যতার গঠনে'র সাধারণভাবে গৃহীত সময়সীমাকে আন্তর্জাতিক স্তরে পুনর্ভাবনার দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করে।

এটি একটি অভাবনীয় উদ্‌ঘাটন। বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র কিছু সময় বা বছরকে এদিক-ওদিক করে দিচ্ছেন না। তাঁদের আবিষ্কার সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ পর্যায়কে কালের নিরিখে আরও পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে (যার তাৎপর্য রয়েছে অধুনা হরপ্পা ও পাকিস্তানের মহেঞ্জোদড়ো এবং গুজরাটের ধোলাভিরার মধ্যেও)— বর্তমান সময়ে যা নির্ধারিত অর্থাৎ ২৬০০-১৭০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৮০০০-২০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের দিকে এবং হরপ্পা-পূর্ব সভ্যতাকে ৯০০০-৮০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে। এই দাবি ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের মৌলিক ধ্যানধারনার পুনর্ভাবনায় উৎসাহিত করবে এবং সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতায় আর্যরা প্রকৃত অধিবাসী কিনা সেই বিতর্কও পুনরুত্থাপিত হবে।

আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী থেকে শুরু করে বি আর আম্বেদকর— প্রাচীন আর্য অনুপ্রবেশ তত্ত্বকে 'আজগুবি' বলে বাতিল করে দিয়েছেন। আর্যতত্ত্বের প্রশ্নটি ভারতীয়ত্বের পরিচিতির ক্ষেত্রেও আলোকদণ্ডের ন্যায় কাজ করছে। আর্য অনুপ্রবেশ তত্ত্বের উদ্গাতা ছিলেন উইলিয়ম জোনস, যিনি ১৭৮৬ সালে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচীন ভাষা প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সদস্য, যাদের অবশ্যই একটি সাধারণ উৎস রয়েছে। ১৮১৬ সালে পৃথক দ্রাবিড়ীয় ভাষা পরিবারের ক্ষেত্রেও একইরকম সনাক্তকরণের চেষ্টা হয়। পরিশেষে ১৯২৪ সালে জন মার্শাল সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার নিদর্শন উদ্ধার করেন।

ঋগ্‌বেদের সাধারণ ঐতিহাসিক কাল সীমা ১৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ (যদিও বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতির্বিজ্ঞানিক প্রমাণ

সাপেক্ষে এর কালসীমা ৪৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন) এবং এর থেকে পুরোনো সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা ভারততত্ত্বকে আরও ভয়ঙ্কর রকমের জটিল করেছে। এই কালের ফারাকটা বর্তমানে আরও বেড়েছে এবং এর ফলে যে প্রশ্ন উঠে আসছে তা আরও বৃহত্তর।

শিক্ষাজগতের এখনো পর্যন্ত এনিয়ে সাধারণ দৃষ্টিকোণ হলো, যেটা পাঠ্যপুস্তকেও গৃহীত যে, আর্যরা ভারতে অভিবাসী। তারা এদেশে এসেছিল মোটামুটি ১৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে। এর বিকল্প তত্ত্ব হলো— আর্যরা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর দেশজ সৃষ্টিকারী। যদিও প্রথাগত ঐতিহাসিকরা প্রায়শই এই তত্ত্বকে অবজ্ঞা করেন, যেহেতু হিন্দু দক্ষিণপন্থী অংশের দ্বারা এটি সমর্থিত।

বর্তমান তথ্যপ্রমাণাদির নিরিখে উভয় তত্ত্বই অপর্যাপ্ত। সাধারণ এই ধারণাটিও ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে যে সাদা চামড়ার অনুপ্রবেশকারী আর্যরা কালো চামড়ার স্থানীয়দের পরাজিত করেছিল। শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আর্যদের অভিবাসন ও প্রসারণের এই অস্পষ্ট ধারণা চলে আসছে। এই অনুপ্রবেশকারী তত্ত্ব মূলত ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমুলারের মতো কিছু ঔপনিবেশিক পণ্ডিতের জাতিগত পাঠের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। যাঁদের ধারণা ছিল যেহেতু ঋগ্‌বেদ কিছু জাতিগত পরিভাষা ব্যবহার করেছে আর্যদের ক্ষেত্রে যেমন তাদের সুন্দর নাক (সুশিপ্র) এবং তাদের শত্রু কিংবা দাসদের চিহ্নিত করা হয়েছিল নাকহীন কিংবা থ্যাবড়া-নাক (বৃষশিপ্র) দিয়ে, তাই আর্যরা বহিরাগত। ভাষাবিদরা পরবর্তীকালে দেখিয়েছেন যে এটা ছিল ভুল পাঠ।

পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণাদির দ্বারা অর্থাৎ বেদে যেহেতু 'ইন্দ্র অভিযুক্ত' তাই তাঁকে হরপ্পার ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার। তিনি ১৯৪৬ সালে সেখান থেকে কিছু কঙ্কাল উদ্ধার করেন এবং ঋগ্‌বেদে যেহেতু ইন্দ্রকে দুর্গের ধ্বংসকারী (পুরেন্দ্র) হিসেবে বর্ণনা করে বহু আগে তাঁর সম্ভ্রমহানি করেছিল তাই মর্টিমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে আমেরিকান জর্জ এফ ডেলস বিপর্যয়ের প্রমাণ হিসেবে দু'টি হরপ্পান কঙ্কালের হদিশ পান।

যেমন গ্যালিলিও শতাব্দী-প্রাচীন বিশ্বাস যে পৃথিবী মহাবিশ্বের মাঝখানে রয়েছে— এই ধারণা পরিবর্তিত করেছিলেন, তেমনি বর্তমান তথ্যপ্রমাণাদি পুরোনো ধ্যানধারণার ওপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। থমাস ট্রটম্যান যিনি অর্থশাস্ত্রের দিক নির্ণয়ের গাণিতিক মডেলের প্রয়োগকারী তিনি ওই উভয় তত্ত্বের মধ্যে কিছু ফাঁক দৃষ্টিগোচর করিয়েছেন। প্রচলিত ধারণাটিকে আজও প্রচলিত হিসেবেই মেনে নেওয়ার একমাত্র কারণ হলো যেহেতু ধারণাটি সর্বপ্রথমে উত্থাপিত হয়েছে এবং 'প্রমাণাদির বাধ্যবাধকতা তাদের স্কন্ধেই অর্পিত হয় যাঁরা প্রচলিত ধারণার বাঁধভাঙা আবেগে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন।' এই বক্তব্য স্রেফ ভাষাগত। যদি সত্য দেখিয়ে দেয় ধারণাটি আপাতযুক্তি গ্রাহ্য, তবে ওরকমই হবে।

প্রকৃতপক্ষে, অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রবহমাণতা রয়েছে যেমন হরপ্পা এবং আর্যদের আদি শিবমূর্তির ক্ষেত্রে। এদের সাংস্কৃতিক ব্যবধানও ততটা বেশি নয়, যেমনটি আগে ভাবা হয়েছিল। এমনকী অশ্বের অনুপস্থিতি, মিথ্যা প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা সত্ত্বেও, অনতিক্রমণীয় নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সারকোটজ থেকে প্রাপ্ত ঘোড়ার হাড় চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করেছেন বিশ্বের অন্যতম নামি প্রত্ন প্রাণীবিজ্ঞানী সুন্দর বোকোনাই। বস্তুগত পুনর্ভাবনার জন্য আমাদের অতি অবশ্যই বাম কিংবা দক্ষিণপন্থী— আদর্শগত চরমপন্থা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।

তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়াল? হয় ভারতীয়রা বিশ্বের সর্বপ্রথম স্বীকৃত সভ্য জাতি, অথবা আর্যরা দেশজ, অবশ্যই বর্তমান সমস্যার ক্ষেত্রে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। এটা তাঁদের জন্য কিছুই করতে পারবে না যাঁরা গভীর দারিদ্র্য কিংবা খরার সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। বর্তমানের দিশা হিসেবে অতীত কখনও বা অপ্রাসঙ্গিকও। যদিও অতীতের ছায়া ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক সময়ই দীর্ঘতর হয়েছে। আজকের রামজন্মভূমি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিবা ফুলে যুক্তি দিয়েছিলেন যে বনবাসীরা প্রকৃত ভারতীয়। আরও ভালোভাবে বললে মিথ তৈরি রাজনৈতিক বিনোদনের মধ্যে পড়ে। বিষয় হিসেবেও এটি কাজে দেয়। বিজ্ঞতার ভান আত্মপরাজয়ের সামিল।

(সৌজন্যে : টাইমস অব্ ইন্ডিয়া, মতামত ব্যক্তিগত)

আবেদন

নাম : সৌম্যদীপ দাস, বয়স : ৯ বছর
পিতা : জয়শঙ্কর দাস,
গ্রাম : কলিগ্রাম, থানা : চাঁচল
জেলা : মালদা

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুটি বর্তমানে কলকাতা টাটা হসপিটালে চিকিৎসাধীন। জেনারেল ওয়ার্ড, বেড নং-৫। চিকিৎসার জন্য প্রায় ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা ব্যয় হবে। শিশুটির চিকিৎসার জন্য সহৃদয় মানুষদের কাছে সাধ্যানুসারে সহায়তার আবেদন জানানো হচ্ছে। আপনার মূল্যবান সাহায্য শিশুটিকে নব জীবন দান করবে।

অর্থ সাহায্য পাঠান ঃ
NAME : JAYSANKAR DAS
STAT BANK OF INDIA
CHANCHAL BRANCH
AC NO.-30965131499
IFSC CODE-SBIN0002037

যোগাযোগ ঃ
8001065790 (ছোটন)
রেণুবালা ফার্মেসি,
কলিগ্রাম, মালদা

চিঠিপত্র

হিন্দুমান

গত ২৭ মে ২০১৬, দুপুর ১২.৪৫ মিনিটের পর রেডরোডের বিশাল মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দ্বিতীয়বারের জন্য মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিচ্ছেন। শপথবাক্য পাঠ করার সময় তিনি বলেন— 'ঈশ্বর ও আল্লার' নামে শপথ নিয়ে বলছি...।

'ঈশ্বর ও আল্লার' নামে শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শপথ নিলেন। অন্যান্য বিধায়করা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতো শপথ নিলেন। হিন্দু বিধায়করা 'ঈশ্বর ও ভগবানের' নামে শপথ নিলেন, আর মুসলমান বিধায়করা 'আল্লা বা খোদার' নামে শপথ নিলেন। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কেন?

তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা। তাই ঈশ্বর বা ভগবানের নামেই তো শপথ নেওয়া উচিত ছিল। তিনি হঠাৎ 'ঈশ্বর ও আল্লার' নামে শপথ নিলেন কেন? আমি আমার ৭৮ বৎসর বয়সকালের মধ্যে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি বলে মনে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে ছোটবেলায় দেখা একটি যাত্রাপালার দুটি চরিত্রের সংলাপের কথা মনে পড়ে গেল। যাত্রাপালার নামটা মনে পড়ছে না। কিছু সংলাপ কথা মনে আছে। প্রথম চরিত্রটি হিন্দুমান এবং দ্বিতীয় চরিত্রটি একজন পথিক। পথিক সাধারণ পোশাক পরিধান করে অভিনয় করছিল। কিন্তু 'হিন্দুমানের' পোশাকে বৈচিত্র্য ছিল। ডান দিকে কোমর থেকে ধুতি পরা এবং বাম দিকে কোমর থেকে লুঙ্গি পরা। বাম গালে মুসলমানদের মতো দাড়ি এবং ডান গাল কামানো, মাথায় 'টিকি' এবং গায়ে নামাবলি জড়ানো। দুটি চরিত্রের সংলাপের কিছু অংশ বর্ণনা না করলে আমার এই লেখার সারমর্ম পাঠকদের বোধগম্য হবে না।

পথিক— 'তুমি কে বাবা'?

হিন্দুমান— 'আমি হিন্দুমান'।

পথিক— 'হিন্দুমান' বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ।

হিন্দুমান--- হিন্দুর 'হিন্দু' আর মোসলমানের 'মান' এই দু'টি শব্দ যোগ করে হলো 'হিন্দুমান'।

পথিক— তোমার উপাসনা পদ্ধতি কি?

হিন্দুমান— আমার উপাসনা পদ্ধতি 'পূমাজ'।

পথিক 'পূমাজে'র অর্থ কি জানতে চাইলে তার উত্তরে হিন্দুমান বলেছিল, পূজার 'পূ' এবং নামাজের 'মাজ' শব্দ দুটি মিলে হলো 'পূমাজ'। সেইকালে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি প্রচলিত ছিল না বলেই হয়তো 'হিন্দুমান' কথাটা বলা হয়েছে। অতীতে এরূপ ঘটনা যদি দিদি ঘটাতেন তাহলে বাংলার দিদিকেও সবাই 'হিন্দুমান' বলেই গণ্য করত।

২৭ মে ২০১৬, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে 'ঈশ্বর ও আল্লার' নামে শপথ নিয়ে বঙ্গবাসীকে বোঝাতে চাইলেন যে, তিনিও 'হিন্দুমান' অর্থাৎ খাঁটি 'সেকুলার'।

অতীতে গান্ধীজী রামধুনে 'আল্লা'কে ঢুকিয়েও ভারতকে অখণ্ড রাখতে পারেননি। ভারত ভাগ হয়েছে। দিদি হিজাব পরিধান করে ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ করে, ইন্সাল্লা ও খোদা হাফেজ বলে, মন্ত্রগুপ্তির শপথ অনুষ্ঠানে 'ঈশ্বরের' সঙ্গে 'আল্লা'কে যোগ করে শপথ নিয়ে পশ্চিমবাংলাকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারবেন তো?

—**শ্রীগুরু চন্দ,**
হরিণঘাটা, নদীয়া।

মাতৃভাষায় ডাক্তারি পরীক্ষা

কয়েকদিন আগে পত্রিকায় প্রকাশিত মাতৃভাষায় ডাক্তারি পরীক্ষা দেবার দাবিতে ভাষা ও জনচেতনা সমিতি আন্দোলন করেছে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এই পত্রের অবতারণা। প্রত্যেকটি রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ-সহ) চাপে পড়ে কেন্দ্র সরকার আঞ্চলিক ভাষায় নিট-এর প্রশ্নপত্র করতে বাধ্য হয়। এবারের আন্দোলনের দাবি হলো, মাতৃভাষায় ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। তিনি ডাক্তার হলে তাঁর প্রেসক্রিপসানও বাংলায় হবে। রোগের নামও বাংলায় (পশ্চিমবঙ্গের কথায় বলছি), যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষাও লিখতে হবে বাংলায় একথা মনে পড়লেই তো আতঙ্কিত হতে হচ্ছে। কারণ বাংলায় পরীক্ষা, ইংরাজিতে যাবতীয় টেস্ট, প্রেসক্রিপসন কী করে হবে। যদি তাই হয়, বাংলার প্রেসক্রিপসন অন্য রাজ্যের ওষুধের দোকানদার পড়তে পারবে না। বাংলার বাইরে বেড়াতে যাওয়া লোকটি আঞ্চলিক ভাষায় লেখা প্রেসক্রিপসানের জন্য মারা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই ধরা যাক একটি রোগীর যাবতীয় টেস্ট করতে হবে, তাহলে বাংলায় পরীক্ষা দেওয়া ডাক্তারবাবুরা লিখবেন বাঁদিকের বুকের রঞ্জনরশ্মি করাতে হবে। আচ্ছা এন্ডোসকপির বাংলা ইসিজি, হল্টার মনিটারিং, রক্তের লিপিড প্রোফাইল, এসবের বাংলা যদিও কোনোরকমে করা যায় কিন্তু ল্যাবরেটরিগুলির অবস্থা তো সঙ্গিন হয়ে উঠবে।

জন্ডিস হলে কি প্রেসক্রিপসনে ন্যাবা লিখবে, টাইফয়েড বা ম্যালেরিয়া হলে তার বাংলা কী হবে? যেহেতু মাতৃভাষায় ডাক্তারি ও নীট পরীক্ষা করার দাবি উঠেছে তাহলে তো সবই মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। শুনলে হাসিও পায়। এই প্রকার অন্য দাবি তো শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ পরিণতি।

একটা মানুষের বা রোগীর জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করার আব্দার খুবই বিপজ্জনক। মন্ত্রীদের জানা উচিত বাংলায় পাশ করা কোনো ডাক্তার ওষুধের গায়ে লেখা ইংরাজি পড়তে পারবে না। তাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। কারণ তাদের উচ্চশিক্ষা সুদূর পরাহত। পৃথিবীতে বহু দেশ আছে তারা কিন্তু ডাক্তারি পড়ে ইংরেজিতে। তাদের দেশের হোক, বিদেশি কোম্পানির হোক, ওষুধের সিরাপের প্যাকেট, ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশনের গায়ে লেবেল ইংরেজি ভাষায় লেখা থাকে। যারা বিদেশে এফ আর সি এস, এম আর সি ও জি পড়তে যায় তাদের সকলের মিডিয়াম হয় ইংরেজি।

সুতরাং প্রত্যেক রাজ্যের মন্ত্রীদের উচিত

ডাক্তারি পড়ার মাধ্যমকে মাতৃভাষায় করার দাবিদারদের ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া সারাবিশ্বে যেখানে ডাক্তারি পড়ার পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যম ইংরাজি, সেখানে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার চেষ্টা যেন না করা হয়।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী।

জাতীয়তাবোধে আস্থা

'হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবোধের প্রতি বাংলার মানুষের মনে আস্থা জাগছে'— গূঢ়পুরুষের কলমে প্রকাশিত (স্বস্তিকা ৩০ মে ২০১৬) প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। হিন্দুত্ব জাগলে জাতীয়তাবোধ জাগে। এই বাংলায় হিন্দুত্ব তীব্রভাবেই জেগে ছিল ২০১৪ সালে মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ২৮২ আসন লাভ করে একটা মজবুত সরকার তৈরি হওয়ার পর। সেই লোকসভা ভোটে বাংলা বিজেপির ভোট হঠাৎ ৪ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশে পৌঁছেছিল। তখন রাজ্যে এমন হাওয়া উঠেছিল যে ২০১৬ নির্বাচনে বিজেপি বিজয়ী দল রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কট্টর সিপিএমের লোককেও (আমারই সহকর্মী) বলতে শুনেছি 'আমাদের তো কখনই লোকেরা ভরসা করবে না, তাই আমরা টিএমসি-কে হারাতে প্রয়োজনে বিজেপিকে ভোট দেব।' রাজ্যে তখন খাগড়াগড় বিস্ফোরণ, সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবি আই জোর কদমে এগিয়ে চলছিল। দিদির চোখেমুখে চরম আতঙ্ক লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেই জোয়ার আবার হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। অনেকের ধারণা দিল্লীর সঙ্গে রাজ্যের বিল পাস সংক্রান্ত বোঝাপড়া নাকি হয়েছিল। বিজেপি সমর্থক বা কর্মী যদি মার খায়, আক্রান্ত হয়, ঘরবাড়ি পোড়ানো হয়, আর রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি যদি তাদের নিরাপত্তার কোনো চেষ্টা না করে তাহলে মার না খেয়ে শাসক দলে ভিড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। নেতাজী বলেছিলেন, একসঙ্গে দুজন বিপরীতধর্মী ব্যক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা যায় না। তাই তিনি বৃটিশের চাকরি না করে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে। ঠিকই তো; ডাক্তার যদি রোগীর প্রতি এবং রোগের প্রতি সমান সহানুভূতিশীল হন, তাহলে রোগ সারানো কেবল কঠিন নয়, দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, জীবন সংশয়ও হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার অযৌক্তিক বিল না আনলে, কোনো দলকে তেল মাখাতে হবে না। আর যদি যুক্তিপূর্ণ জরুরি প্রয়োজনীয় বিল বিরোধীরা পাস করাতে বাধা দেয়, সেক্ষেত্রে তারা জাতীয় স্বার্থের শত্রু তা জনসমক্ষে তুলে ধরে বিজেপিকে আরো বেশি ক্ষমতা দিয়ে সরকার গড়ার সুযোগ দেওয়ার আবেদন করা যেতে পারে। কংগ্রেসের নেতাজী-শ্যামাপ্রসাদ-লালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গভীরতা, পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার উদাহরণ, কাশ্মীরকে সমস্যায় রূপান্তরিত করা ইত্যাদি। বর্তমানে যেভাবে ভারতকে গ্রাস করার আই এস চক্রান্ত প্রকাশ্যে আসছে, তাতে জাতীয়তাবোধ আরো দ্রুত গড়ে ওঠার কথা। সবশেষে, ছোটো ছোটো জাতীয় উপকার হতে পারে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় বড় মাপের প্রতিক্রিয়া হয়, এমন জাতীয় উপকার করার দরকার কী। যেমন অবসরপ্রাপ্তদের জমানো বিশেষ অ্যাকাউন্টের সুদের হার কমানো, পি এফ-এর টাকার উপর আয়কর চাপানো। পি এফ-এর টাকা স্বচ্ছ টাকা, আয়কর দিয়েই তা জমানো হয়। দেশ যেদিন ১০০ শতাংশ দুর্নীতি মুক্ত হবে, সেইদিন এই ধরনের কর নেওয়া যেতে পারে। তবে সব কিছুর উপর প্রচার প্রয়োজন।

—**টিমিড পেনস্পিকার,**
বর্ধমান।

আর এস এস-এর গণবেশ

বিনীত প্রার্থনা— দীর্ঘ ৯১ বছরের ঐতিহ্য কি না ভাঙলে চলতো না? বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দর্জির দ্বারা প্রস্তুত সঙ্ঘের ওই হাফপ্যান্ট ছিল আমাদের প্রাণভোমরা। সেই কবে গয়ায় প্রথমবর্ষ শিক্ষাবর্গ করেছি, পবিত্র স্মৃতি হিসাবে ওটিসি-তে ব্যবহৃত খাকি প্যান্ট, বেল্ট, টুপি, অতি সযত্নে তুলে রেখেছি। বয়সের ভারে যদিও প্যান্টটি খানিকটা জীর্ণ হয়ে পড়েছে, তথাপি ওর বিশ্রাম নেই। এখনও এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও আর এস এস-এর বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমে বহু পুরাতন খাঁকি প্যান্টটি ব্যবহার করতে গর্ববোধ করি। একদা স্থানীয় সঙ্ঘবিরোধী কিছু যুবকেরা খাঁকি হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় আমাদের দেখলেই বিদ্রুপ করতো, বর্তমানে তারাই আবার আমাদের পূর্ণ গণবেশে দেখলে শ্রদ্ধা করে। অতএব সঙ্ঘের খাকি হাফপ্যান্টের কোনো বিকল্প নেই ও হয় না। পরম পূজনীয় গুরুজীর আমলে কলকাতার শহিদ মিনারে বহু অনুষ্ঠানে শারীরিক কার্যক্রমে পূর্ণ গণবেশে অংশগ্রহণ করেছি। সে দৃশ্য ভোলার নয়।

আমার বেশ মনে আছে, ১৯৭৩ কিংবা ১৯৭৪ সাল নাগাদ লাল বুটের পরিবর্তে নির্দেশ আসে চামড়ার জুতো। হোস পরিবর্তন করে আনা হয় মোজা ইত্যাদি। কিন্তু খাকি হাফপ্যান্টের আজ পর্যন্ত কোনো বদল হয়নি। নব গণবেশে বাদামি রংয়ের ফুলপ্যান্টে রুট মার্চ সাধারণ মানুষ মনে প্রাণে মেনে নেবে না। আমি একজন প্রবীণ স্বয়ংসেবক হিসাবে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিগণের কাছে একান্ত অনুরোধ করছি দয়া করে খাকি হাফপ্যান্ট বাতিল করবেন না।

—**পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়,**
শিবপুর, হাওড়া-২।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে...

প্রণব বর

নিজ কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রভু কুবের কর্তৃক এক বছরের জন্য প্রিয়া বিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে রামগিরি পর্বতে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে, যেখানে জনকতনয়া মাতা সীতাকে নিয়ে বনবাসের দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, সেখানেই নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছে কোনো এক যক্ষ। পাঠকের কৌতূহল দমন না করে জানিয়ে রাখি নবোঢ় এই যক্ষ অলকাপতি কুবেরের পদ্মবনের এক রক্ষী ছিলেন। শুক্লা একাদশীর সেই রাতে নবপরিণীতার জন্য চঞ্চল চিত্তে কিছুক্ষণের জন্য সেই যে গেলেন, বিধির লিখনে সেই রাতে হাতির আক্রমণে পদ্মবন হলো নষ্ট— সকালে পূজার জন্য কুবের পদ্ম পেলেন না। ফল! সেতো জেনেছি ইতঃপূর্বেই। কিন্তু তার পর? রামগিরির কালো রাত আর কাটে না, একে একে বিরহের কয়েক মাস কেটে গেল। কনক বলয় খসে খসে পড়ছে, বাজুতে সে আর থাকে না, বিনিদ্র রজনী আর কাটে না। বিরহী আত্মা যেন অনিষ্টটাই আগে কল্পনা করে। প্রেয়সীর কোমল জীবন রক্ষণীয়। আশ্বস্ত করতে হবে তাকে আমি বেঁচে আছি, তুমি জীবনধারণ করো আর কয়েকটা দিন মাত্র!

আষাঢ়ের প্রথম দিনে নবীন মেঘের ঘনঘটা বিরহী যক্ষের বেদনা যেন কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুললো। তার প্রেয়সীর কাছে বার্তা প্রেরণের জন্য আকুল হয়ে সে প্রার্থনা জানালো সেই মেঘের কাছেই— ওহে মেঘ তুমি তো মহান, তোমার কাছে প্রার্থনা করে যদি বিফল হই তাও শ্রেয়, কারণ অধমের কাছ থেকে কিছু লাভ করাও তো গ্লানিকর। আর তুমি তো ওই পথেই যাবে, না হয় একটু ঘুরপথেই তোমার গন্তব্যে পৌঁছলে। হে মেঘ, তুমি এপথে যাবে, কারণ সেটা তোমার জন্যেও লোভনীয়— এভাবে মেঘের সামনে এক অনুপম আকর্ষক যাত্রাপথের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তৎকালীন ভারতের ভৌগোলিক জ্ঞানে জ্ঞানী কবি কালিদাস। সেই বর্ণনার মধ্যে সম্পদ ঐশ্বর্য বিলাস অভিসার সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার পুণ্য পবিত্রতা ত্যাগ... কী নেই, লোভনীয় সেই যাত্রাপথ! পথে পড়বে বিশীর্ণা রেবা, মেঘ সেই বিরহী নায়িকার সঙ্গে মিলিত হতে পারে, আবার শীর্ণকায় হয়ে পড়লে সুন্দরীদের কেশপাশ প্রসাধনের যে ধূম, তা দিয়ে নিজ কলেবর একটু বাড়িয়ে নিতে পারে। পথে আর যেখানে যক্ষের বিরহী প্রিয়া আছেন, স্বর্গও যাকে ঈর্ষা করে, সেটি অলকাপুরী। যাত্রাপথে যেমন ঐহিক আকর্ষণ আছে তেমনি উজ্জয়িনীর মহাকালের দর্শনলাভের মতো পুণ্যও আছে। সম্ভবত কবি জানতেন এর পরে কোনো পুরুষের পক্ষেই ওই দায়িত্ব পালনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হবে না। সেখানে মেঘতো এক সুপুরুষ...উল্টোদিক থেকে কোনো এক অজানা ভয় কাজ করতে থাকলো, কী জানি সেও বিরহিণী তরুণী, এই মেঘও সুপুরুষ— কোনো অঘটন ঘটবে না তো!! শেষ করলেন অতি সাবধানে... ওহে মেঘ, তুমি তোমার 'ভগিনী'র জীবন রক্ষার জন্য আমার এই বার্তা নিশ্চয়ই পৌঁছে দেবে।

আজকের হোয়াটসঅ্যাপ্ ফেসবুকের যুগে প্রশ্ন জাগে কবি কালিদাসের এমন মেঘকে দিয়ে বার্তা পাঠানোর কাজটা পাগলামো ছাড়া আর কী? উত্তরটা কবি নিজেই দিয়ে রেখেছেন— প্রেমিক বেচারার কাছে চেতন-অচেতনের আর ভেদ কোথায়! শাপগ্রস্ত দশা না হোক বিরহকাতরতা থেকে এযুগেও কি আমরা মুক্ত হতে পেরেছি, সম্ভবত এটাই চিরন্তন সত্য। আর তেমন দুঃসহ মুহূর্তে এক দূতের প্রয়োজন এসে পড়ে যুগে যুগে। যেমন রামায়ণে সীতার কাছে শ্রীরামচন্দ্রের দূত হিসাবে গিয়েছিলেন স্বয়ং হনুমান। মহাভারতে দময়ন্তীর কাছে দূত হিসাবে পাঠানো হয়েছিল এক হংসকে। সচেতন দূতের পরম্পরাকে উল্লঙ্ঘন করে কালিদাস অচেতন দূতের কল্পনা করলেন এটাই বিশেষত্ব। আষাঢ়ের প্রথম দিনটা বিরহীদের কাছে বার্তা প্রেরণের দিন হিসাবে বেঁধে না রেখে, দিনটি আরো অনেকখানি ব্যাপ্তি অর্জন করে কালিদাসজয়ন্তী রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাতে হানির কিছু নেই। এক স্রষ্টার প্রথম পরিচয় তার সৃষ্টি। আসুন, একবার দেখি কে এই কালিদাস—

কিংবদন্তীতে কালিদাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন কতগুলি উপাখ্যান— যাতে এক চরম মূর্খের অথবা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষে উত্তরণের কথা শ্রুত হয়। সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রসঙ্গকে এড়িয়ে এখান থেকে প্রেরণা গ্রহণই কর্তব্য। তাঁর তিন কাব্যের (কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার) তিন প্রথম শব্দ (অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষঃ) নিয়েই সম্ভবত এমন লোককথার প্রচলন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশিয়ম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ (নাটক), কুমারসম্ভব, রঘুবংশ (মহাকাব্য), মেঘদূত, ঋতুসংহার (গীতিকাব্য)-এর স্রষ্টা মহাকবি কালিদাস। এছাড়াও যে গ্রন্থগুলি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত দেখা যায় তা উত্তরকালের অন্য কোনো কবির রচনা বলেই ধরে নিতে হবে। তাঁর জন্মস্থান বা জন্মকাল নিয়ে তিনি নিজে কিছুই বলেননি। শ্রেষ্ঠলোকেরা যেমন হয়ে থাকেন, আত্মপরিচয়বিমুখ। নানা মুনির নানা মত থাকা সত্ত্বেও, উজ্জয়িনীর বর্ণনার প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণ ও দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে পণ্ডিতেরা উজ্জয়িনীকেই তাঁর জন্মস্থান অথবা কর্মস্থান বলে অনুমান করেছেন। আর কাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আক্ষেপ—'হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল'। তবে অধিকাংশের মতে বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন--- মহাকবি কালিদাস।

দাসপুরের মা আনন্দময়ী কালী

গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী

দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামেরই মধ্য দিয়ে গিয়েছে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোড। দাসপুর বাসস্ট্যান্ডে নেমে ডান দিকের পিচ রাস্তা ধরে একটু গেলেই মায়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দির। মন্দিরটি কয়েকশত বছরের প্রাচীন। আজ যেখানে মন্দির, পূর্বে সেখানে মনুষ্য পর্যন্ত বসবাস ছিল না। এখন অবশ্য মন্দিরের আশপাশে কিছু লোক বসবাস করতে শুরু করেছেন। তবে তারা বেশিরভাগই মায়ের মন্দিরে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত রয়েছেন। কেউ মায়ের ফুল তোলে, কেউ মন্দির ঝাড়ু দেয়, আবার কেউ মায়ের পূজার বাসন মাজেন।

মায়ের মূল পূজারি ছিলেন চক্রবর্তীরা। এই বংশের একজন ছিলেন সীতারাম। শোনা যায়, তিনি উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং গৃহত্যাগ করে কাশীধামে গমন করেন। সেখানে তিনি ঘোর তপস্যায় রত হন। এক রাতে তিনি মায়ের স্বপ্নাদেশ পান— 'আমি গঙ্গায় রয়েছি, তুই আমাকে এখান থেকে তোর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা কর'। এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর সীতারাম মাকে দাসপুরে নিয়ে আসেন ও আনন্দময়ী কালী নামে প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর 'সীতারাম ব্রহ্মচারী' নামে পরিচিত হন ও দেবীকে পঞ্চমুণ্ডির বেদিতে স্থাপন করে পূজা-অর্চনা শুরু করেন। এই বেদির নীচে রয়েছে পূজারির আসন, সেটি একটি মুণ্ডির উপর অবস্থিত।

মায়ের সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি ও প্রবাদ রয়েছে। তবে বর্তমান বাস্তববাদী সমাজে তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা বোঝা মুশকিল। প্রবাদ প্রবাদই। তবে এখানকার মানুষজন মায়ের এই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে খুবই বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন মা ভবতারিণী, অতীব জাগ্রতা ও আনন্দময়ী।

এইরূপ জনশ্রুতি রয়েছে যে পূর্বে রাত্রিতে মায়ের মন্দিরের রাস্তা ব্যবহার নিষেধ ছিল। তথাপি সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করে নিধুবামুনের দাদা মায়ের আটচালায় দাঁড়িয়ে চৌকিদারি হাঁক দেন ও মায়ের কোপে পড়েন। সেই রাত্রিতেই ঘরে ফিরে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন এবং জ্বরের ঘোরে শুনতে পান মা আনন্দময়ীর আদেশ, 'তুই আমার মন্দিরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়েছিস, তোকে আমি আর রাখব না'। পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনাবসান হয়।

এরূপ আর একটি প্রবাদ রয়েছে যে— চক্রবর্তী পরিবার একবার চরম আর্থিক অনটনে পড়ে। কীভাবে মায়ের পূজা-অর্চনা করা যায় সেই চিন্তায় তাঁরা বিব্রত হয়ে পড়েন। তখম মা ব্রহ্মচারীকে স্বপ্ন দেন বর্ধমানের রাজার কাছে যাওয়ার জন্য। প্রথমে রাজা ব্রহ্মচারীকে ভণ্ড সাধু ভেবে তাড়িয়ে দেন। মায়ের আদেশে তিনি পুনরায় রাজার কাছে যান। এর পরের ঘটনা কিছুটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। রাজা ব্রহ্মচারীকে পরীক্ষা করার জন্য বলেন, ''তোমার মা যে আছেন তার প্রমাণ দিতে হবে। যদি তুমি খড়ম পায়ে হাল করা (চাষ করা) জমিতে ছুটতে পারো এবং তোমার খড়মে কাদা না লাগে, তাহলে তুমি যতদূর যাবে সব জমি আমি তোমার মাকে দান করবো।'' সীতারাম ছিলেন এক উচ্চকোটির তান্ত্রিক। তাই রাজার শর্ত মেনে তিনি হাল করা ভিজে জমিতে ছুটে ছিলেন। মায়ের কৃপায় তাঁর খড়মে কোনো কাদা লাগেনি। রাজা মাকে দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈদ্যপুর মৌজায় এক প্লটে আড়াই শো বিঘা জমি শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করেন। এছাড়া রাজা মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁর অস্ত্রাগার থেকে একটি অস্ত্র সন্ন্যাসীকে দেন। এই অস্ত্র 'বাঁকি' নামে পরিচিত। এই বাঁকি কেবলমাত্র দীপান্বিতা কালী পূজার রাত্রিতে ছাগবলির জন্য বাইরে আনা হয়। বাঁকির বলিদান দেখার জন্য দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন আসে, পূজা দেখে ও প্রসাদ গ্রহণ করে। এই বাঁকির বৈশিষ্ট্য হলো, বাঁকির কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে ধার রয়েছে। কালীপূজার আগের দিন উপবাসে থেকে কামার মন্দিরে বসে বাঁকিতে ধার দেয়। এই বাঁকি কেবলমাত্র কালীপূজার রাত্রিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিন অন্য কাটারিতে বলিদান করা হয়।

সীতারাম ছিলেন মহা সাধক ও সন্ন্যাসী। দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময় তিনি ঘোর তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর দেহাবসানের পর মন্দিরের পিছনে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর কালীপূজার আগের দিন বর্তমান পূজারি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ করেন। সেদিন বিশেষ পূজাপাঠ করা হয় ও ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বর্তমানে চক্রবর্তী পরিবারের দৌহিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার মায়ের সেবায় রয়েছেন। এই বংশের শ্রীপঞ্চানন, শ্রীপরিতোষ ও শ্রীশশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়রা মায়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শশধর মহাশয়ের সময়ে মায়ের শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরের প্রভূত সংস্কার করা হয়।

কালীপূজার রাত্রিতে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। মা আনন্দময়ী অত্যন্ত জাগ্রতা, স্নেহবৎসলা ও আনন্দদায়িনী।

পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর চব্বিশ পরগনার গঙ্গা তীরবর্তী এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ পানিহাটি। ওই জনপদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতিকে বহন করে চলেছে। পুরী যাওয়ার পথে এবং পুরী থেকে গেড়ি যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পানিহাটি গঙ্গার ঘাটে অবতরণ করেছিলেন। তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল পানিহাটির মাটি। গঙ্গার তীরে সেই ঘাটটি 'শ্রীচৈতন্যের ঘাট' নামেই ভক্তদের কাছে পরিচিত। শোনা যায়, ১১০২ বঙ্গাব্দে রাজা বল্লাল সেন ওই ঘাট তৈরি করে দিয়েছিলেন। ওই ঘাটের ঠিক উপরেই আছে একটি অতি প্রাচীন বটগাছ। কথিত আছে এই বটবৃক্ষের নীচেই ভগবান চৈতন্যদেব ও প্রভু নিত্যানন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাওয়ার আগে প্রভু নিত্যানন্দকে দায়িত্ব দিলেন গৌড়ের ঘরে ঘরে নামকীর্তন প্রচার করার। সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে নিত্যানন্দ একদিন নৌকাযোগে গঙ্গাতীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে নামকীর্তন করতে করতে পানিহাটির সেই 'শ্রীচৈতন্য ঘাটে' নামলেন। সেই সময় সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য মজুমদারের ভক্তিপ্রাণ ভাইপো রঘুনাথ মজুমদার ওই সুপ্রাচীন বটগাছের নীচেই দাঁড়িয়েছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করার জন্য রঘুনাথ ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানান। সেই সঙ্গে রঘুনাথ বলেন, এত দেরি করে তিনি কৃপাপ্রার্থী হতে এসেছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছেন। তাই তিনি নিত্যানন্দের কাছে এই স্বকৃত অপরাধের জন্য দণ্ড বা শাস্তি প্রার্থনা করেন। বিনয়ী রঘুনাথের মুখে একথা শুনে নিত্যানন্দ তাঁকে দু' হাত বাড়িয়ে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, ''তোমার মতো বিনয়ী বৈষ্ণবের বৈষ্ণব সেবাই দণ্ড।' এখানে উপস্থিত বৈষ্ণবদের দই-চিড়ে দিয়ে মহোৎসব করাও। আমি তোমাকে এই দণ্ডই দিলাম।'' সেই শুভ দিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সেদিন নিত্যানন্দের নির্দেশে রঘুনাথ ওই সুপ্রাচীন বটগাছের নীচে দই-চিড়ে দিয়ে মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এই উৎসবই বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে 'দণ্ড মহোৎসব' নামে পরিচিত। সেই থেকে রঘুনাথ প্রতি বছর বৈষ্ণব ও ভক্তের সমন্বয়ে এই মহোৎসবের আয়োজন করতেন। রঘুনাথের পর পানিহাটি নিবাসী রাঘব পণ্ডিত এই উৎসব পালন করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পানিহাটির সেন পরিবার এই উৎসবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আজও জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটিতে এই উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ বহুবার দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করেছেন। ১৮৮৫ সালে অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার এসেছিলেন পানিহাটির মহোৎসবে। এই উৎসবে উপস্থিত থেকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করতেন। পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে এক মহামিলন মেলা। হাজার হাজার ভক্তের প্রাণ মাতানো কীর্তনে মেতে ওঠে মহোৎসব প্রাঙ্গণ। বহু বিদেশি ভক্তও দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করে উৎসবের কৌলীন্য বৃদ্ধি করেন।

পশ্চিমবঙ্গের জন্মকথা

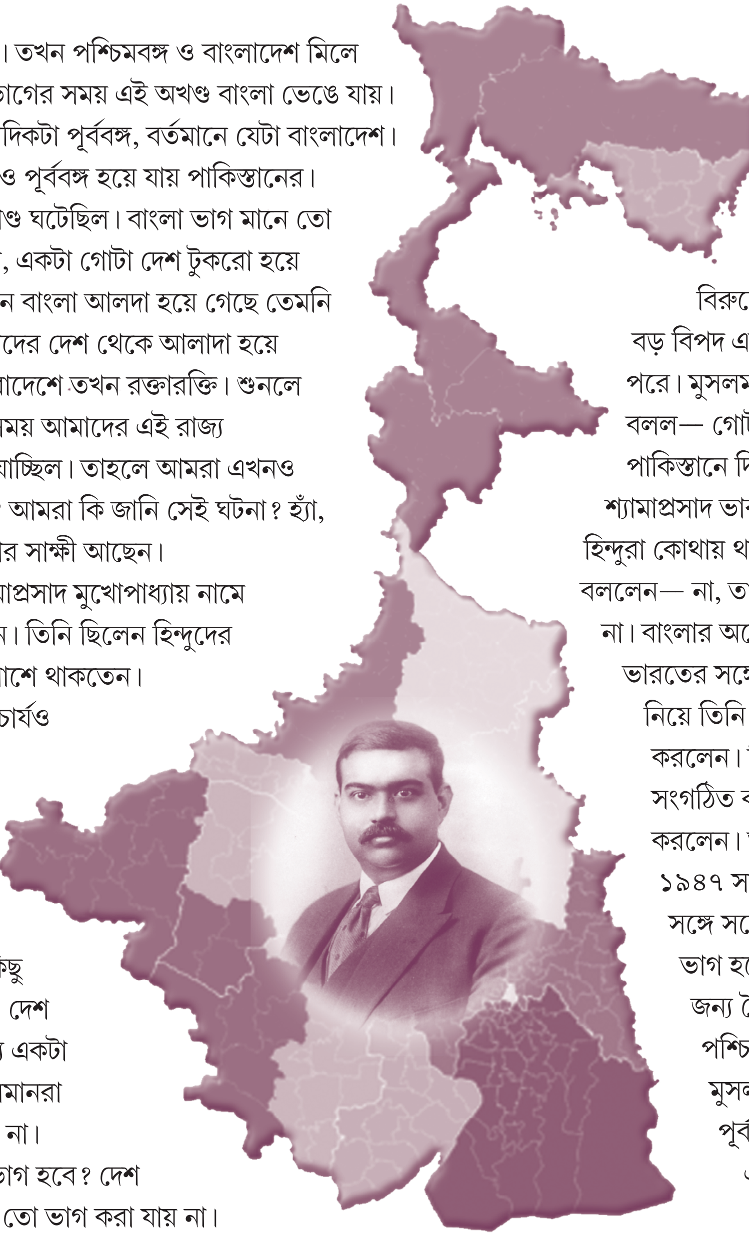

স্বাধীনতার আগেকার কথা। তখন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলে ছিল অখণ্ড বাংলা। কিন্তু দেশভাগের সময় এই অখণ্ড বাংলা ভেঙে যায়। একদিকটা হয় পশ্চিমবঙ্গ, অন্যদিকটা পূর্ববঙ্গ, বর্তমানে যেটা বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায় ভারতে ও পূর্ববঙ্গ হয়ে যায় পাকিস্তানের।

সেই সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটেছিল। বাংলা ভাগ মানে তো শুধু বাংলাদেশের বিভাজন নয়, একটা গোটা দেশ টুকরো হয়ে যাওয়া। আমাদের এদিকে যেমন বাংলা আলদা হয়ে গেছে তেমনি ওদিকে পাঞ্জাবের অর্ধেক আমাদের দেশ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারাদেশে তখন রক্তারক্তি। শুনলে অবাক হবে যে, দেশভাগের সময় আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল। তাহলে আমরা এখনও কীভাবে ভারতের সঙ্গে আছি? আমরা কি জানি সেই ঘটনা? হ্যাঁ, আমাদের অনেকেই সেই ঘটনার সাক্ষী আছেন।

সেই সময় কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামে একজন মহান জননেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন হিন্দুদের নেতা। সুখে, দুঃখে হিন্দুদের পাশে থাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছিলেন তিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের মুহূর্তের সময় তখন। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে। ভারত স্বাধীন হবে। সেই সময় আমাদের দেশের কিছু মুসলমান নেতা বললেন যে— দেশ স্বাধীন হলে মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা দেশ দিতে হবে। মুসলমানরা ভারতের সঙ্গে থাকতে পারবে না।

মহাবিপদ! দেশ কী করে ভাগ হবে? দেশ আমাদের মায়ের মতো, তাকে তো ভাগ করা যায় না। গান্ধীজীর মতো নেতারাও চিন্তায় পড়ে গেলেন। কী করে এই সমস্যার সমাধান হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন— না, দেশ কিছুতেই ভাগ হতে দেওয়া যাবে না। মুসলমান নেতারা সেই কথা মানলেন না। পাকিস্তান নামে তাদের একটা আলাদা দেশ চাই-ই চাই। শুরু হলো দাঙ্গা হাঙ্গামা। হিন্দুদের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন লাগিয়ে দেওয়া, খুব-খারাপি। দিন দিন ক্রমশ তা বাড়তে লাগলো। হিন্দুরা খুব ভয় পেয়ে গেল। দেশের বড় বড় নেতারা তখন বললেন— ঠিক আছে, দেশের যেখানে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা বেশি সেইসব জায়গা নিয়ে তৈরি হবে পাকিস্তান। শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু তখনো দেশভাগের বিরুদ্ধে অনড়। বড় বিপদ এলো তারও পরে। মুসলমান নেতারা বলল— গোটা বাংলাটাকেই পাকিস্তানে দিতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ ভাবলেন তাহলে হিন্দুরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন— না, তা কিছুতেই হবে না। বাংলার অর্ধেক থাকবে ভারতের সঙ্গে। এই দাবি নিয়ে তিনি আন্দোলন শুরু করলেন। হিন্দুদেরকে সংগঠিত করতে শুরু করলেন। তার ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দুই ভাগ হলো। হিন্দুদের জন্য তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গ, মুসলমানদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান। একদিকটা হলো ভারত, একদিকটা পাকিস্তান। সেদিন যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকতেন তাহলে আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও পাকিস্তান হয়ে যেত।

বিরাজ নারায়ণ রায়

মনীষী কথা

রানি লক্ষ্মীবাঈ

১৮৪২ সালে গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে বিয়ে হলো লক্ষ্মীবাঈয়ের। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ঝাঁসির রানি হয়ে এলেন তিনি। রাজ্যজুড়ে আনন্দ উৎসব, আলোর রোশনাই। সেই আনন্দ আরো বেড়ে গেল যখন ঘর আলো করে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্মালো। নাম রাখা হলো দামোদর। কিন্তু হায়, চার মাস পরে সেই পুত্র সন্তানের মৃত্যু হলো! রাজা তখন এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করলেন। তারও নাম রাখা হলো দামোদর।

ইংরেজ তখন ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছে। তারা ঘোষণা করল কোনো দত্তক পুত্র রাজা হতে পারবে না। রাজা গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর শুরু হলো রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের ঝাঁসি রক্ষার লড়াই। তিনি বললেন 'মেরি ঝাঁসি দেঙ্গি নেহি'। প্রাণপণে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ১৮৫৮ সালে রণক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন এই বীরাঙ্গনা।

প্রশ্নবাণ

১. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান গভর্নর কে?
২. 'রামচরিতমানস' কার রচিত?
৩. কলকাতা, দিল্লী, মুম্বই, চেন্নাই—এই চারটি শহর কোন্ সড়ক যোজনার দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে?
৪. শরৎচন্দ্রের প্রথম সাহিত্য পুরস্কার কী?
৫. ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনালে 'ম্যান অব দ্যা ম্যাচ' কে?

উত্তর : ১. রঘুরাম রাজন। ২. তুলসীদাস। ৩. সোনালি চতুর্ভুজ। ৪. জগত্তারিণী। ৫. মহিন্দর অমরনাথ।

ছবিতে অমিল খোঁজ

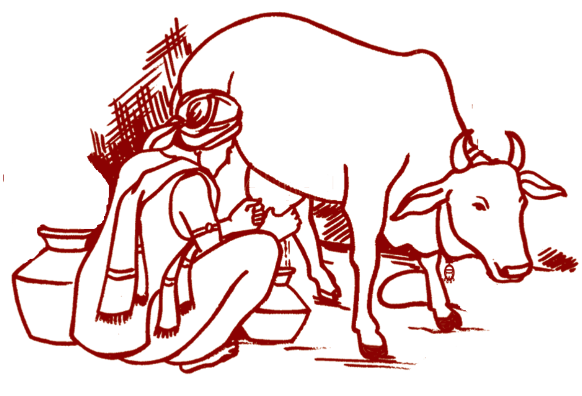

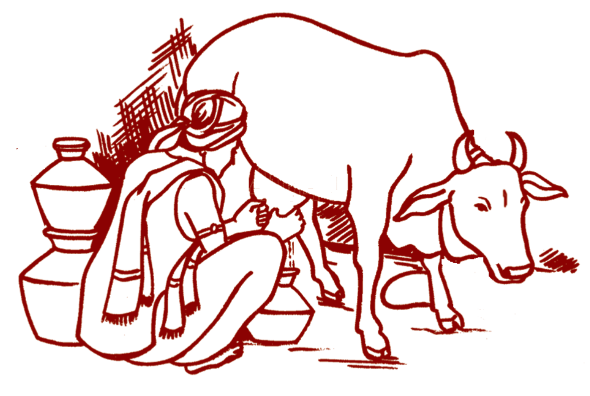

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) কা ন্ন রা ন্ধ অ
(২) ব গ ভ ল্ল জ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) কা বা য় লু ম
(২) ক ন্ধু ণা রু সি

৩০ মে সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) মহিষাসুর (২) গোলকধাঁধা

৩০ মে সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) অচলায়তন (২) আলাপচারিতা

উত্তরদাতার নাম

(১) অরিত্র নন্দ, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর (২) তুহিন কুমার বিশ্বাস, গাজোল, মালদা
(৩) রাজেশ দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া (৪) সমন্বিতা সাহা, মঙ্গলবাড়ি, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

অপচয় রোধে মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

অঙ্গনা

কর্মরতা থেকে গৃহবধূ বেশিরভাগ মহিলাই অপচয় পছন্দ করেন না। আমাদের ঘরে খাদ্যান্নের অপচয় ফ্রিজের কল্যাণে অনেকটাই কমেছে। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও আমরা বাড়ির কাজের লোকেদের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সাহায্য করে থাকি। অনেকসময় পাড়ার ক্লাব বা পল্লীমঙ্গল সমিতির সহায়তায় মহিলাদের অংশগ্রহণ খুবই সন্তোষজনক হয়ে দাঁড়ায়। পাড়ার ছেলেরা গরিব দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দিদিমা, জেঠিমা, কাকিমা, বৌদিদের কাছেই আবেদন জানায়। তারা জানে যে, এখান থেকে খালি হাতে ফিরতে হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাড়ির কর্তাদের থেকে বেশি গিন্নীরা কেন উদারহস্ত হন? কারণ সংসার খরচ থেকে এঁরা কিছু অর্থ আলাদা করে তুলে রাখেন। সেই থেকেই সমাজের কল্যাণসাধন হয়। এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, একজন ব্যক্তির অপচয় রোধ করার চেষ্টা থেকে একটি পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য আসছে। আবার, ওই পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য হাসিমুখে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। এইরকম বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, কাশ্মীর থেকে কেরল, গুজরাট থেকে অসম সর্বত্র প্রায় একই চিত্র। বিভিন্ন সমাজ যখন পৃথক- পৃথকভাবে উপকৃত হয়— তখন সমগ্রদেশ সমষ্টিগতভাবে উন্নতির পথ ধরে এগিয়ে যায় বিশ্ব-বসুধার কল্যাণসাধনে। আমাদের পূর্বপুরুষরা জগতের কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করেছেন :

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগভবেৎ।।

সাধারণত দেখা যায় যে, মহিলারা অপ্রয়োজনে আলো, পাখা, টিভি ইত্যাদি চললে বেশ বিরক্ত হন, তারপর একটু বকুনি দিয়ে সেগুলি বন্ধ করে দেন। আপাতদৃষ্টিতে বাড়ির সদস্যরা এতে খিট্‌খিটে মানসিকতার প্রকাশ দেখলেও আদতে কিন্তু মহিলারা বিদ্যুৎ এবং অর্থ দুয়েরই সাশ্রয় করে থাকেন।

পাম্পে করে জল তোলার সময় মহিলারা সতর্ক থাকেন, যাতে জল উপচে না পড়ে। আসলে আমরা মানি যে জল বয়ে যাওয়া মানে অর্থ বয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রেও মহিলারা স্বভাববশত জল, বিদ্যুৎ ও অর্থের সাশ্রয় করেন।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কেনার সময় মহিলারা ভালো জিনিসকেই বেশি গুরুত্ব দেন। রান্নাঘরে গ্যাস বাঁচানোর কতরকম উদ্ভাবনী শক্তি যে মহিলাদের আছে, তা ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। সরকার থেকে প্রচার করা হয়, একটি গ্যাসের সিলিন্ডার একটি ছোট পরিবারের এক মাসের ইন্ধন। কিন্তু অনেক মহিলা আছেন যাঁরা একটি গ্যাস সিলিন্ডার নিয়মিত ব্যবহার করে তিন মাস পর্যন্ত চালিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে অপচয় রোধ করে গ্যাস এবং অর্থ দুয়েরই সাশ্রয় করেন।

অনেক সময় দেখা যায়, বাড়িতে সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়ার সময় সুস্বাদু খাবারগুলি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। যে খাবারগুলি অপেক্ষাকৃত কম পছন্দের সেগুলি পড়ে আছে মহিলাদের জন্য। তাঁরা কিন্তু এই নিয়ে মন খারাপ করতে বসেন না, বরং নষ্ট না করে খুবই স্বাভাবিকভাবে সেগুলি গ্রহণ করে থাকেন। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওই বাড়ির কোনো সদস্য এজন্য মহিলাদের কুড়াদান বা ডাস্টবিন বলতেও দ্বিধা করেন না। অথচ, এরকম বলা মানুষটি কখনো পেটুক স্বভাবের জন্য এতটুকু অনুতপ্ত হন না। এক তো ভাল ভাল খাবারগুলি নিজে গলাধঃকরণ করেছেন, উপরন্তু বাড়ির মহিলারা সবার জন্য সুস্বাদু রান্না করে সবাইকে খাইয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাই তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নেন, কারণ বাড়ির সবাইকে ভালভাবে খাইয়েই তাঁরা তৃপ্ত হন, নিজেদের জন্য কী রইল তা নিয়ে ভাবতে বা অনুযোগ করতে বসেন না— সেই অন্নদাত্রীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধটুকু দেখান না! ওই মহিলারা একদিকে ইন্ধন, খাবার আর অর্থের সাশ্রয় করলেন, অপরদিকে কথাও শুনলেন।

বাড়ির মহিলারা বাইরে বেরুলে গাড়ির ব্যবহার কম করে থাকেন, পরিবর্তে পায়ে হেঁটে চলাই বেশি পছন্দ করেন। এইভাবে তাঁরা পেট্রোল বা ডিজেলও অর্থ উভয়ই বাঁচান। বাজারে গেলে দরদাম করে ভাল জিনিস আনেন, অথচ নিজের জন্য বিশেষ চাহিদা তাঁদের থাকে না। কারণ বাড়ির সবার মধ্যেই তাঁরা নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন। বাচ্চাদের জন্যও থাকে তাঁদের কড়া শাসন, সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না।

এইরকম আরও নানা উপায়ে মহিলারা সংসারে অর্থ সাশ্রয় এবং পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ করে থাকেন। বস্তুত আগামী প্রজন্মেরও মহিলাদের এই কর্মকুশলতার জন্য ঋণ স্বীকার করা উচিত এবং বর্তমান সমাজেরও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মহিলাদের এই ছোটো ছোটো কিন্তু উচ্চমানের বিভিন্ন উপায়ে অপচয় রোধের জন্য। এতকিছুর পরেও বাড়ির মহিলারা যখন সংসারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন, তখন পুরুষেরা বলে ওঠেন, 'মেয়েছেলের কথায় কান দিলে চলে না।' ওহে পুরুষমানুষেরা! এই 'মেয়েছেলে'র জন্যই তোমাদের এই পৃথিবীতে আসা, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন অতিবাহিত করা। সুতরাং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করো, চোখ মেলে দেখো কী মহাকর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে চলেছে এই অতি সাধারণ মহিলারা!

অতিথি কলম

নীতি ও পন্থা
এক ভারসাম্যের বিষয়

কে এন গোবিন্দাচার্য

জমিদারি প্রথা বিলোপ বা শহরাঞ্চলে জমির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া দুইয়ের মধ্য থেকে দীনদয়ালজী খুঁজে পেয়েছিলেন 'অন্ত্যোদয়'।

বৃটিশরা ১৯৪৭-এ ভারত ছেড়েছিল কিন্তু রেখে গিয়েছিল এমন এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার উত্তরাধিকার, যার থেকে পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক মানসিকতা দানা বাঁধে। বিশেষ করে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারেই ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয় যা ভারতীয় মানসিকতার অনুরূপ ছিল না। ভারতের নিজস্বতা রাজনীতির মধ্য দিয়ে বিকাশ হওয়ার কথা ছিল। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। —যদিও তা পরিপূর্ণ নয়। এই প্রেক্ষাপটেই ২১ অক্টোবর ১৯৫১ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তিনি তাঁর প্রথম সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন— শুধুমাত্র নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্যই ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়নি। গণতন্ত্রে নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং আমরা সাধ্যমতো প্রার্থীদের মাধ্যমে আমাদের মতাদর্শকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারব এবং জনসমাজে আমাদের দলকে জাতীয় দল হিসাবে শক্ত ভিতের উপর স্থাপিত করতে পারব। নির্বাচনের ফল যাই হোক না কেন, আমাদের দল জনসমাজে একটা আশা ও সদিচ্ছার বার্তা দিতে পারবে এবং উৎসাহিত করবে, যার দ্বারা সুখী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে।

জনসঙ্ঘের পূর্ণদায়িত্ব এখন এসে পড়ল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের উপর। ১৯৫০-এর পরে ভারতের দৃষ্টি, প্রয়োজন ও সামাজিক প্রভাবের ভিত্তিতে ভারতীয় সংসদ ও দলীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করার প্রসঙ্গ এসে গেল। সেই কারণে ভারতীয় দৃষ্টিতে একটি রাজনৈতিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দিল যা কমিউনিজম ও তার বাহ্যিক প্রবাহকে টেক্কা দিতে পারে। স্বাভাবিকভাবে নতুন নতুন পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে করা হতে থাকল এবং মতাদর্শগত, সাংগঠনিক, রাজনৈতিক দিক থেকে নতুন পথের সন্ধান চলতে থাকল— দীনদয়ালজী এই সব বিষয় সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি তাঁর কর্ম, ভাষণ ও সদিচ্ছার দ্বারা সংগঠনকে প্রসারিত করে গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখলেন। এ ব্যাপারে তিনি খুব স্পষ্ট ছিলেন— যে কোনো লিখিত মত (ডক্যুমেন্ট) বাস্তবে রূপ নিতে পারে যদি সেটা ঠিকমতো পড়া হয়, পর্যালোচনা করা হয় এবং কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য হয়। তাঁর গণতান্ত্রিক চিন্তায় এই কথাই প্রকাশ পেত যে উভয়পক্ষের অর্থপূর্ণ বার্তালাপ এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধি সংগঠনের জন্য খুবই প্রয়োজন।

বর্তমান পরিস্থিতির মূল কারণ হলো ভারতের জাতীয় জীবনের মূল সত্যকে না জানা এবং জাতীয় জীবনে বৈদেশিক আদর্শ ও মূল্যবোধকে চাপিয়ে দেওয়া। দ্রুত প্রগতি করতে গিয়ে আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করেছি এবং অন্যদেশের পদ্ধতিকে অন্ধ অনুকরণ করেছি।

দীনদয়ালজী ছিলেন মূলত একজন চিন্তাবিদ। যে কোনো সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টার সঙ্গে তাৎকালিক সমাধানও কীভাবে বের করা যায় তার জন্য তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর এই প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ভাবনা-চিন্তায়, তাঁর লেখা প্রবন্ধে, প্রস্তাবের খসড়ায় এবং রচিত ('ভারতীয় অর্থনীতি : বিকাশ কি এক দিশা') গ্রন্থে। সেই সময় জনসমাজে সমাজনীতি, সমবায়িক কৃষি, ভারী শিল্প, রাসায়নিক কৃষি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রভাব ছিল। কিন্তু দীনদয়ালজী জম্মু- কাশ্মীরের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পূর্বপাকিস্তান থেকে চলে আসা হিন্দুদের নিয়ে সমস্যা (১৯৫৫), ১৯৬২-র চীনা আক্রমণ ইত্যাদি ভারতীয় রাজনীতিকে নাড়া দিয়েছিল, তিনি ভালভাবেই জানতেন যে রাজনীতি খুব সহজ পথ নয়। এর মধ্যে অনেক উত্থান পতন আছে, জটিলতা আছে ও সামঞ্জস্যের অভাব আছে। সুতরাং প্রত্যেকের নিজস্ব লক্ষ্যে স্থির থাকা উচিত এবং নিজস্ব মতাদর্শের ভিত্তিতে রূপরেখা রচনা করা উচিত। এই সমস্ত রূপরেখাকে বাস্তবে রূপদান করা যাবে— এই ভাবনার উপর ভিত্তি করেই নীতি নির্ধারণ করা উচিত। তিনি ড. মুখার্জীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেবল মাত্র একটি পথ; মূল উদ্দেশ্য নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দলের চারটি স্তম্ভ— মতাদর্শ, সংগঠন, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নির্বাচন, যাকে চেয়ারের চারটি পায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা দলের কাজকর্মে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে। এর মধ্যে বেশি জোর দেওয়া উচিত আদর্শ ও সংগঠনের উপর। কারণ এই দুটিই কর্মীদের আদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সংগঠনের ভিত মজবুত করবে— কিন্তু কোনোটাই সহজ কাজ নয়।

১৯৬৫-তে বিজাওয়াড়ায় দ্বাদশতম দলীয় অধিবেশনে তিনি 'Principles and Policy' শীর্ষক একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন— যার মধ্যে ১৯৫০-পরবর্তী রাজনীতির ঘটনা, অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা বলা হয়েছিল। এই প্রস্তাব

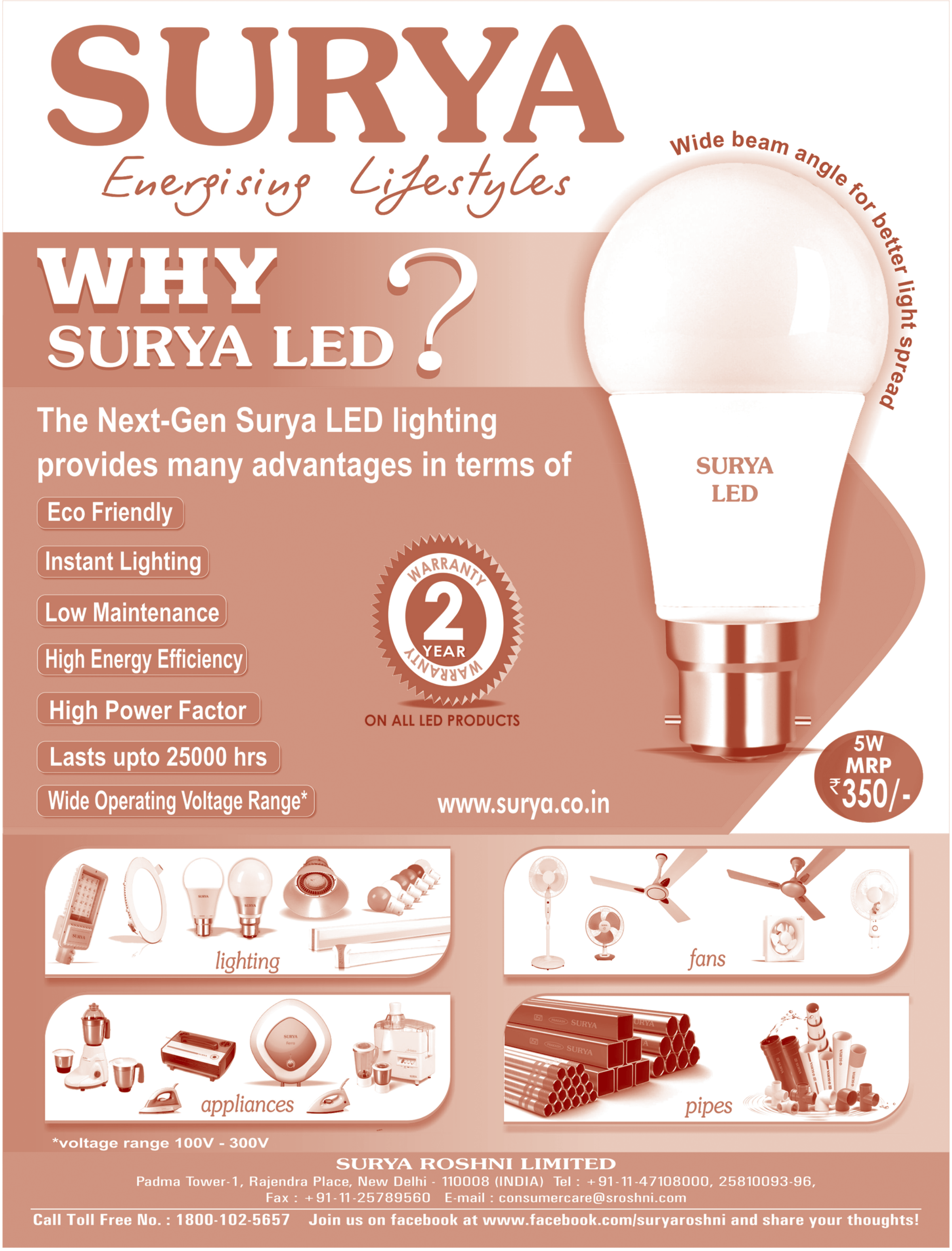

SURYA
Energising Lifestyles
Wide beam angle for better light spread
WHY SURYA LED?
The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of
Eco Friendly
Instant Lighting
Low Maintenance
High Energy Efficiency
High Power Factor
Lasts upto 25000 hrs
Wide Operating Voltage Range*
SURYA LED
WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS
5W MRP ₹350/-
www.surya.co.in
lighting
fans
appliances
pipes
*voltage range 100V - 300V
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

দল সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে, পরে এই প্রস্তাবই দিশা হিসেবে উপস্থাপিত হলো। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে একাত্ম মানবতার নীতিই জনসঙ্ঘের নীতিতে পরিণত হলো। এই প্রস্তাবই দলের আদর্শগত ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল জনসঙ্ঘে এবং বর্তমান বিজেপি-তে।

এই প্রস্তাবের দুটি অংশ— নীতি ও পন্থা। নীতিসমূহ সাধারণত অপরিবর্তনীয় এবং দলের কর্মীদের কাছে উৎসাহ সৃষ্টিকারী, দিশা দর্শনকারী, কালজয়ী। যাইহোক, বর্তমান জাতি ও জাতীয়তা নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষাপটে এটা পরিষ্কার যে এই জাতি অতি প্রাচীন এবং স্বাধীনতা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এবং ভারত এক নতুন জাতি— এই ধারণাকে নসাৎ করেছে। স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় জাতীয়তার মূল ভিত্তি হলো ভারত এবং তার সনাতন সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস। ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট মত— ভারত এক এবং একাত্ম। মিশ্রসংস্কৃতির ধারণা শুধু এর বিপরীতই নয়, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী।

১৯৬৫ সালে ভারতের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দীনদয়ালজী যা বলেছিলেন তা আজও সত্য। তিনি বলেছিলেন--- বর্তমান পরিস্থিতির মূল কারণ হলো ভারতের জাতীয় জীবনের মূল সত্যকে না জানা এবং জাতীয় জীবনে বৈদেশিক আদর্শ ও মূল্যবোধকে চাপিয়ে দেওয়া। দ্রুত প্রগতি করতে গিয়ে আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করেছি এবং অন্যদেশের পদ্ধতিকে অন্ধ অনুকরণ করেছি। নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব না করলে স্বাধীনতা অর্থবহ হয় না এবং দেশের সুখ ও স্বাধীনতা অনুভব করার মতো কাজ করার মানসিকতাও নির্মাণ হয় না। নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন যে মানুষের 'ভিশন' বা দৃষ্টি নিজের থেকে আসে এবং সমাজের মাধ্যমে তা চরম সত্য (Ultimate Supreme Reality)-র সঙ্গে মিলিত হয়--- যা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও একাত্ম। তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক দিশাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারত বরাবর একটি আদর্শ ধর্মরাজ্য; মৌলবাদী নয়। কারণ এখানে সমস্ত মত ও পথের প্রতি সমান সম্মান দেখানো হয়। দীনদয়ালজীর মতে 'আইনের শাসন' ও 'ধর্মরাজ্যের' অর্থ অনেকটা সমার্থক। নীতির ব্যাখ্যায় এটা গ্রহণযোগ্য যে গণতন্ত্র হলো অখণ্ড এবং সহিষ্ণু। ব্যক্তির মর্যাদা, সমাজের মান্যতা এগুলি হলো তার স্বাদ। নির্বাচনের সময় প্রতিনিধি চয়ন করে সরকার গঠন করা হলো গণতন্ত্রের মূল কাজ। বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও ভোগ করা আর্থিক গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন। সুযোগ ও মানদণ্ডের জন্য সামাজিক গণতন্ত্রের প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের মতো স্বাধীনতাও অখণ্ড। আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ছাড়া মানুষের পক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক (আংশিক) স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়, আবার সামাজিক স্বাধীনতা না থাকলে সমাজে অর্থের অভাবে দাস প্রথা নেমে আসবে। পুঁজিবাদ অনুসারে অর্থের বা সম্পদের মালিকানা কোনো ব্যক্তির আর সাম্যবাদ অনুসারে সম্পদের মালিকানা থাকে সরকারের। দীনদয়ালজীর মতে দেশে সম্পদ প্রচুর উৎপন্ন হবে এবং তার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিতরণ প্রয়োজন। এই সামঞ্জস্যের ভিত্তি অবশ্যই সংস্কৃতি, সংস্কার ও শিক্ষা। এগুলিই ধর্মের নামান্তর। কেবল তখনই মানুষ অর্থনৈতিক জীব হয়ে উঠতে পারবে না যখন সে সামাজিকভাবে সুখী হবে।

সুতরাং একাত্ম মানবদর্শন অনুসারে— স্বদেশি ও বিকেন্দ্রিত অর্থনীতির মূল ভিত্তি আবার বিশুদ্ধ জনমত ও বিকেন্দ্রীকরণ সরকারের মানসিকতা নির্ধারণ করে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে তিনি বলতেন— ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল পশ্চিমি মতাদর্শের ওপর নির্ভরশীল এবং পশ্চিমের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা কেবল সেই সমস্ত দলগুলির নকল বা হাতের পুতুল। তারা ভারতের ইচ্ছা বা চাহিদাও পূরণ করতে পারবে না, আবার বিশ্বের দরবারে নেতৃত্বও দিতে পারবে না।

দীনদয়ালজী 'এক জাতি, এক সংস্কৃতি' এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন এবং অনুভব করতেন যে জাতীয় সংহতি তরান্বিত করার জন্য এটা আবশ্যিক। এক অখণ্ড রাজ্যের দ্বারাই এইরকম ভাবনার বাস্তবতা সম্ভব। তিনি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পরিবর্তে ১০০টি জনপদ গঠন করতে চেয়েছিলেন যার ভিত্তি হবে দেশের অতীত ও জনসাধারণের স্বাভাবিক সদিচ্ছা। তিনি পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থার পক্ষেও মত পোষণ করেছিলেন।

আমরা যদি শিক্ষা, বিদেশি ভাষা, কৃষি, বনজসম্পদ, শিল্প সংক্রান্ত পথ ও পদ্ধতির দিকে তাকাই এবং ওই প্রেক্ষিতে প্রস্তাবের আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে বেশিরভাগই বর্তমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি গো-সংরক্ষণ ও গোহত্যা নিবারণ সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে কষাইখানা বন্ধের পক্ষেও মত দিয়েছিলেন। একদিকে জমি বাসযোগ্য করা বা ভূমিহীন শ্রমিককে দেওয়া, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, জোতদারদের বা শহরে জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ণয়— সবকিছুর মধ্যে দীনদয়ালজী 'অন্ত্যোদয়ে'র পাশেই থাকতেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ১ : ২০-র বেশি হওয়া উচিত নয় আবার ১ : ১০-এর নীচে থাকাও উচিত নয় এবং তা সংস্কারের মধ্য দিয়ে অর্জিত হওয়া দরকার। তিনি চাইতেন জাতীয় স্তরে আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে মানুষের চিকিৎসা হোক এবং তার জন্য উচ্চ গবেষণা চালু থাকুক।

প্রস্তাবের শেষ অধ্যায়ের নাম ছিল— 'আমাদের ভগবান'। এতে দীনদয়ালজীর ব্যক্তিত্ব ও ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছিল। এই একটি পরিচ্ছদে তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের বিশ্বাসের মূলবিন্দু, আমাদের ভগবান, আমাদের কাজের মাধ্যম, সাফল্যের মাপকাঠি সবই হলো সেই মানুষ যে আক্ষরিক অর্থে গৃহহীন এবং উপেক্ষিত। আমাদের উদ্দেশ্য হলো তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা, তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির যথার্থ ব্যবস্থা করা, সে যাতে বিশ্বমানবতার অঙ্গ হিসাবে দেশের কাজে লাগতে পারে— তার জন্য আধ্যাত্মিক স্তরে উৎসাহিত করা।

আজ দেশের রাজনীতি অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও সুবিধাবাদিতার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে এবং দেখে মনে হচ্ছে তা পথ হারিয়েছে। এই প্রস্তাব (নীতি ও পন্থা) আগামী দিনে সমাজের দিক-নির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারবে এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও এগিয়ে যাবে। আজকের দিনে রাজনীতিকে আরও অর্থবহ করে তোলার ক্ষমতা এর মধ্যে আছে।

(লেখক একজন স্বদেশি চিন্তাবিদ)

শাহবানু থেকে সায়রা বানু

মুসলমান মহিলাদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে মৌলবিতন্ত্র

শাহবানু

ইন্দোরের অ্যাডভোকেট আহমেদ খানের পত্নী শাহবানু। পাঁচ সন্তানের জননী ৬২ বছরের শাহবানুকে ১৯৭৮ সালে তালাক দেন তাঁর স্বামী। তালাকপ্রাপ্তা শাহবানু আদালতের শরণাপন্ন হলে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে আদালত ১৯৮৫ সালে তাঁর স্বামীকে খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। মুসলমান ভোটব্যাঙ্ককে মাথায় রেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শীর্ষ আদালতকে পাশ কাটিয়ে শাহবানুকে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

দীপ চক্রবর্তী

সারা বিশ্বে মুসলমানরা সকলের হাঁড়ির খবর রাখেন। কিন্তু তাঁদের অন্দরমহলের খবর জানা কার্যত অসম্ভব ব্যাপার। সম্প্রতি দুই অসমসাহসিনী মহিলার দৌলতে পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

প্রথমে মুখ খুলেছিলেন উত্তরাখণ্ডের সায়রাবানু। কয়েকদিন আগে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আফসা নাম্নী আরও একজন। দু'জনেরই প্রতিবাদ মুসলিম পারসোনাল ল'-এর অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা তিন-তালাকের বিরুদ্ধে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে দু'জনেরই দাবি, আদালত অবিলম্বে এই প্রথাকে অসাংবিধানিক এবং বেআইনি ঘোষণা করুক। স্বাভাবিক ভাবেই দুই মহিলার আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। আর ঠিক তখনই আসরে নেমে এর প্রতিবাদ করে মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড এবং জামিয়ৎ উলেমা। আশার কথা, কেন্দ্রীয় সরকার এদের চাপে মাথা নোয়াতে রাজি নয়। সরকার যত দ্রুত সম্ভব সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে আদালতে পেশ করতে চলেছে। এখন প্রশ্ন হলো দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত তিন-তালাক প্রথার বিরুদ্ধে দুই আবেদনকারিণী সহ কয়েক লক্ষ মুসলমান মহিলার (সঙ্গে রয়েছেন বেশ কিছু পুরুষও) এত ক্ষোভ কেন? ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরান এই বিষয়ে কী বলছে? প্রথমেই বলে রাখা ভালো ভারতে প্রচলিত মুসলিম আইনের কোনোটাই আল্লার বিধান নয়। মৌলবিরা নিজেদের স্বার্থে এইসব আইন বানিয়ে, চাপিয়ে দিয়েছে মানুষের ওপর। ফলত এই আইন কোরানের ভাব এবং দর্শনের পরিপন্থী। যেমন কোরানের ৩৫ নং আয়াতের সম্পূর্ণ উল্টো সুরে মুসলিম পারসোনাল ল' বলছে— বিবাহবিচ্ছেদের জন্য মুসলমান পুরুষের কারও সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। বিবাহবিচ্ছেদ সম্পূর্ণই পুরুষের ইচ্ছা, বিবেচনা এবং বিচারাধীন। অথচ কোরানে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত মোট ৪৪টি আয়াতে বলা হয়েছে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে না ওঠে এবং বিচ্ছেদের পরিস্থিতি তৈরি হয় তা হলে দু'পক্ষই গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্র বের করার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবে। যদি কোনোভাবেই সমাধানসূত্র বের করা সম্ভব না হয় তখনই বিবাহবিচ্ছেদ কোরানসিদ্ধ। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রীকেও বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া যাবে না, স্বামীও স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। ৩ মাস ১০ দিন তারা এইভাবে থাকবেন। এই সময়ের মধ্যে যদি তাদের বোধোদয় হয় অথবা শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা হলে তাদের বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যাবে। এই প্রাক্-বিবাহবিচ্ছেদ কালপর্বে (৩ মাস ১০ দিন) যাঁরা কোনো সমঝোতায় পৌঁছোতে পারবেন না, তাদের জন্য কোরানে দুটি পন্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এক, স্বামী নিজেই স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পুনর্বার বিবাহ করবেন অথবা, দুই, বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে স্ত্রীকে মুক্তি দেবেন। কোরান বলছে, 'তালাক' দু'বার উচ্চারণ করাই বিধেয়। (সূত্র : সুরাআল বাক্র ২২৯)। সুতরাং তিন তালাকের যে নিয়ম ভারতে প্রচলিত তা ভুল। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে দু'বার

তালাক দেন এবং পুনর্বার বিবাহ না করে তৃতীয়বার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করেন তাহলে তাদের বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ বলে ধরা হবে। এরপর স্বামী বা স্ত্রী কারোরই অন্য কাউকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধা থাকবে না। যদি কোনো মুসলমান মহিলার দ্বিতীয় স্বামী মারা যান অথবা তাঁদের বিয়ে ভেঙে যায় তাহলে তিনি তার প্রথম স্বামীকে বিয়ে করতে পারেন।

ভারতে প্রচলিত মুসলিম ল' অনুযায়ী যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে পিতৃমাতৃহীনদের কোনো অধিকার নেই। অথচ কোরানে অনাথদের বঞ্চিত করা নিষিদ্ধ। যারা করবে তাদের জন্য নরকপ্রাপ্তির মতো ভয়ঙ্কর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। মৌলবিরা প্রকাশ্যেই বলে থাকেন ইসলাম নারী এবং শিশুদের বিন্দুমাত্র রেয়াত করে না। মুশকিল হলো শিক্ষিত মুসলমানেরা মৌলবিদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন। একই কথা বলা চলে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গেও। সকলেই ভয় পাচ্ছেন মৌলবিদের সঙ্গে সংঘাতে গেলে 'কাফের' তকমা লেগে যেতে পারে। অথচ সমস্যাটা তাঁদেরই সম্প্রদায়ের মহিলা ও শিশুদের। এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে! এখন সর্বোচ্চ আদালত যদি মুসলমান মহিলা এবং শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তাহলে মৌলবিরা, তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো হচ্ছে বলে মড়াকান্না শুরু করে দেবে। ইতিমধ্যে শুরু হয়েও গেছে। ১৯৩৭ সালে মুসলিম পারসোনাল ল' ভারতে চালু হয়। বিবাহ মেহ্‌র বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং ওয়াকফ— ইসলামের প্রত্যেকটি আইনই একসঙ্গে এই আইনের আওতাভুক্ত হয়। শর্ত একটাই, এই আইনের বিচারের সময় আদালত হাদিস এবং ইসলামিক আইন নির্দিষ্ট ফতোয়ার ধারা অনুসরণ করবে। কোনোভাবেই ভারতীয় দেওয়ানি বিধি প্রয়োগ করা যাবে না। ১৯৮৫ সালে বিখ্যাত শাহবানু মামলার পর কেন্দ্রের তৎকালীন রাজীব গান্ধী সরকার এই আইনের সংশোধনী চেয়ে সংসদে একটি বিল এনেছিল। কিন্তু মন্ত্রীসভার সদস্য আরিফ মহম্মদের বিরোধিতায় বেশিদূর এগনো সম্ভব হয়নি। তারপর আশ্চর্যজনক ভাবে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। এখন পি. চিদাম্বরম দিগ্বিজয় সিং-য়ের মতো কংগ্রেস নেতারা বলছেন রাজীব গান্ধী সরকারের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল!

সত্যি কথা বলতে কী, যে সব সংগঠন সর্বভারতীয় মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ডকে সমর্থন করছে তারা কেউ ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। এটা বোঝা সত্যিই দুষ্কর, ভারতের অভিন্ন ফৌজদারি ও দেওয়ানি (অংশত) বিধি মানতে যদি মুসলমানদের অসুবিধে না থাকে তা হলে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকারের মতো বিষয়ে আদালতের নির্দেশ মানতে অসুবিধে কোথায়! মুসলিম পারসোনাল ল'-কে বলা হচ্ছে 'ঈশ্বরের নিজের হাতে তৈরি আইন'। অথচ এই আইনে ন্যায় এবং সাম্যের স্থান নেই। ঈশ্বর যদি নিজেই অন্যায় করেন কিংবা বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেন তাহলে ইসলামের সারবত্তা সম্পর্কেই মনে প্রশ্ন জাগে।

সুতরাং সহজ কথা সহজভাবে বলাই ভালো। মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড এবং জামিয়ৎ-ই-উলেমা-ই-হিন্দ সাধারণ মুসলমান মহিলাদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মত্ত। এই অনাচার অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। মুসলমান সমাজকে বুঝতে হবে এইসব ভুঁইফোঁড় সংগঠনের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এরা শুধু আখের গুছোতে এসেছে। সর্বোচ্চ আদালতের কাছে এ নিয়ে আবেদন করা যেতে পারে যে যারা ভারতীয় আইন, কোরান এবং ইসলামিক আইন জানেন এমন মানুষদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক। কমিটি মুসলমানদের (বিশেষ করে মেয়েদের) বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিক। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংসদ আইন তৈরি করুক। মুসলমানদের কাছেই এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হোক— তাঁরা এক কোরান, এক আল্লায় বিশ্বাস করেন কিন্তু কেন তাঁরা এক অভিন্ন আইনের শাসনে বিশ্বাস করেন না? ইসলাম যদি মহিলা, শিশু ও বিধবাদের নিরাপত্তাকে এত গুরুত্বই দেয় তাহলে সেই নিরাপত্তাকে অভিন্ন ফৌজদারি এবং দেওয়ানি বিধির আওতায় আনতে বাধা কোথায়?

সায়রা বানু

উত্তরাখণ্ডের ৩৮ বছর বয়সী সায়রাবানু। গতবছর তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দেয়। এই তালাকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তিনি সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি দাবি জানিয়েছেন মুসলমানদের তিন-তালাক বা তালাক-ই-বাইয়ত প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতনতা দিবসে কেমন আছেন আমাদের প্রবীণ নাগরিকেরা ?

এন সি দে

কয়েকদিন আগে গত ১৫ জুন আর একটি বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতনতা দিবস পেরিয়ে গেল। গত বছর প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ প্রবীণ নাগরিকদের যে সমস্ত করুণ অবস্থার দিকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেই অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। অসহায়, অশক্ত ও পরিত্যক্ত বৃদ্ধ পিতামাতারা আজও নিত্য হয় ক্রিমিনালদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছেন, নয়তো বিশ্বাস করে ঠগবাজদের হাতে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন; কিংবা বিনা চিকিৎসায় অভুক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সকলের অলক্ষ্যে পচাগলা লাশ হয়ে পড়ে থাকছেন বন্ধ ঘরে। আর কপর্দকহীন পিতামাতাদের অবস্থা আরও করুণ। পুত্র ও পুত্রবধূর গঞ্জনা ও লাঞ্ছনায় নিত্য নিগৃহীত হচ্ছেন নীরবে, নিভৃতে। প্রতিবাদের ভাষা তাদের জানা নেই। কারণ আমাদের সমাজে সন্তানের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করতে অভ্যস্ত নয় পিতামাতারা। আইনও তাদের জানা নেই। এরই মধ্যে দু-একটি ঘটনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে পাড়া- প্রতিবেশীরাই কড়া দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা যখন করে, তখনই সকলে জানতে পারেন এই নৃশংস নিগ্রহের কথা। সম্প্রতি এরাজ্যেই এক পুত্র ও পুত্রবধূ বৃদ্ধ পিতাকে গোয়ালঘরে আটকে রাখায় পাড়া- প্রতিবেশীরাই তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বছরের পর বছর ধরে এই ধরনের শারীরিক, মানসিক ও আবেগতাড়িত আর্থিক নির্বুদ্ধিতার শিকার হয়ে চলেছেন আমাদের দেশের বৃদ্ধ পিতামাতারা। ২০০২ সালে 'World Report On Violence And Health, 2002'-এ বলা হয়েছিল যে এই ধরনের প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ হলো হিংস্রতার এক গোপনতম অপরাধ। প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ তাই মানবাধিকার লঙ্ঘন-জনিত এক অপরাধ। ২০১২ সালের ২৫ মার্চ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া'য় প্রকাশিত একটি সার্ভে রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, প্রবীণ নাগরিকদের ৪৪ শতাংশ এই কলকাতা শহরে আত্মীয়দের হাতে নিগৃহীত হন। যদিও সবচেয়ে বেশি বয়স্ক মানুষ নিগৃহীত হন ভূপালে, ৭৯.৩ শতাংশ। শারীরিক দিক থেকে নিগ্রহের ঘটনায় অবশ্য এগিয়ে আছে আমাদের কলকাতা, ২২.৮ শতাংশ।

নিগ্রহের পরিসংখ্যান যেমন এগিয়ে চলেছে, তেমনি এগিয়ে চলেছে সরকারি উদাসীনতা। কংগ্রেস সরকার ২০০৭ সালে বৃদ্ধ পিতামাতাদের সুরক্ষার জন্য 'Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007' আইনটি প্রবর্তন করে। আমাদের প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বারে বারে আবেদন করা সত্ত্বেও বর্তমান কেন্দ্র সরকার গত দু'বছরে আইনটি রাজ্যে রাজ্যে সঠিক রূপায়ণের কোনো সদিচ্ছাই দেখায়নি। এমনকী আইনটি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিরও কোনো চেষ্টা করেনি। বরং ব্যাঙ্ক ও স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে ক্রমাগত সুদ কমিয়ে সুদের উপর নির্ভরশীল অবসরপ্রাপ্ত মানুষগুলির আয় কমিয়ে অসহায় করে তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের নামে একের পর এক ট্যাক্স বা সেস চাপিয়ে জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তার সঙ্গে রয়েছে ক্রমবর্ধমান পণ্যমূল্যবৃদ্ধি। এর সঙ্গে রয়েছে জোর করে সেট টপ বক্স কিনতে বাধ্য করা, বাজার দরে গ্যাস কিনতে বাধ্য করা। এই আর্থিক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ রক্ষা কবচ দূরের কথা; অসহায়, অশক্ত, বহু ব্যয়সাপেক্ষ রোগে আক্রান্ত শয্যাশায়ী বয়োবৃদ্ধদের পর্যন্ত আয়কর থেকে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি।

সরকারি তখতে যারা আছেন তারা কী সরকারি তথ্যেরও খোঁজ রাখেন না যে ১৯৯১ সালে Globalisation, Liberalisation and Privatisation Policy চালু করার পর থেকে কাতারে কাতারে সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী অসংগঠিত ও অপ্রচলিত শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন, যাদের অবসর জীবনের সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই। সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, আমাদের দেশে প্রতি ১০ জন অবসরপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে ৯ জনই কোনো পেনশন পান না। সেই কোন কালে বয়স্ক মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন প্রকল্পে মাসে ২০০ টাকা দেওয়া চালু করেছিল, আজও সেই ২০০ টাকাই চলছে। Parliamentary Standing Committee On the Ministry of Social Justice and Empowerment সেই February, 2014 সালে তাদের রিপোর্টে এই অনুদান ১০০০ টাকার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু এখনও প্রায় ১২ কোটি প্রবীণ মানুষ অসহায়। গ্রামের ৮৬ শতাংশ ও শহরের ৮২ শতাংশ মানুষের কোনো স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থাই নেই।

এই রাজ্যের সরকার জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করায় গত নির্বাচনে বৃহৎ কর্পোরেট লবি চালিত পত্রিকাগুলি এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করলেও জনগণের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাই এবার শুরু থেকেই জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। আশা করা যায়, প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে এই সরকার 'Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007' আইনটি এই রাজ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করবে। পথে ঘাটে, অফিস-আদালতে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেবে।

(লেখক প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ অফ বেঙ্গল'-এর সম্পাদক)

অন্ধকারে জ্বালো আলো

অদ্ভুত রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত ভূ-খণ্ডে একটি কথা খুব প্রচলিত— এখানে ইন্ডিয়া ও ভারত দুটি আলাদা দেশ। ইন্ডিয়া বড়লোকদের— সেখানে আলোর তীব্র জ্যোতিতে ঝলমলিয়ে ওঠে প্রাচুর্য। দিনরাত আলো তাদের নিত্যসঙ্গী। অন্যদিকে গ্রাম প্রধান ভারত— যেখানে কোথাও জ্বলে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো, আবার কোথাও বা পুরোটাই অন্ধকার। তাই সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করতে হয় তাদের।

প্রভো সিং

আমাদের দেশে প্রায় ১৮ হাজার এমন গ্রাম আছে, যেখানকার মানুষ স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও অন্ধকারে আলোর খোঁজ পায়নি। সরকার যদিও চেষ্টা করছে, তবে এত বৃহৎ দেশের অবস্থা রাতারাতি পাল্টানোর নয়। এই ১৮ হাজার গ্রামেরই একটা ছোট্ট গ্রাম নারো কা খেদা, রাজস্থানের উদয়পুর থেকে ২৫ কিমি দূরে। দেশের অন্যান্য গ্রামের মতো এই গ্রামেও সূর্য ডুবলে ঝুপ করে নেমে আসে অন্ধকার। সেই নারোর লোকেদের সামান্য মোবাইলে চার্জ দিতে পাড়ি দিতে হয় ৭ কিলোমিটার পথ। কিন্তু পাকেচক্রে এই অজ পাড়াগাঁ-র সঙ্গেই মিলন ঘটেছে ভারতের রাজধানী শহর দিল্লীর।

২৪-২৫ বছর বয়সী দিল্লীর বাসিন্দা শিখ যুবক প্রভো ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। জীবনের স্বপ্ন স্যুট টাই পরে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে কাজ করা। আগাগোড়া শহরে বেড়ে ওঠা প্রভো কখনও ভাবেওনি যে সে তার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন থেকে দূরে সরে কোনো অজ পাড়াগাঁয়ে রাত কাটাবে। সেখানকার মানুষদের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করবে। কিন্তু কী সেই পরিবর্তন? আর কীভাবেই বা এল সেই পরিবর্তন? পরিবর্তন— একটা অন্ধকার গ্রামকে আলোয় ভরে দেওয়া। প্রভোর নিজের কথায়, ‘ইবে-তে এখন সৌর প্যানেল পাওয়া যাচ্ছে বলে আমরা তিন বন্ধু মিলে আলোচনা করছিলাম। এছাড়াও ইংল্যান্ডের লোকেরা কীভাবে মাছ ধরতে গিয়ে গ্রিড গুলোর মাধ্যমে যথেচ্ছ ভাবে সৌরশক্তির অপব্যবহার করে সেই নিয়েও কথা বলছিলাম।’ ব্যস, এই আলোচনাই সূত্রপাত ঘটালো তার ‘প্রজেক্ট কিরণ’-এর। ‘আমি ভাবলাম পশ্চিমের দেশগুলিতে যদি সৌরশক্তি বিলাসিতার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে তবে আমার দেশে যেখানে ৭৫ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ ছাড়া দিন যাপন করছে, সেখানে এটা একটি প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না?’ ৭ লাখ টাকার প্রয়োজন ছিল তার এই প্রোজেক্টে। কিছু টাকা গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে দিয়েছিল আর বাকি টাকা জুগিয়েছিল North East Centre for Technology Application and Research (NECTAR), কেন্দ্র সরকারের স্ব-শাসিত সংস্থা। প্রভোও অবশ্য এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রামের অর্থনীতিতে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল। শুধু টাকা দিয়ে বা উদ্যোগ নিয়েই সে থেমে থাকেনি, বিদ্যুৎহীন গ্রামে গিয়ে সে তাদের অবস্থাটা অনুভব করারও চেষ্টা করেছে— ‘‘আমি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কাজ করেছি, থেকেছি, তাদের অন্ধকার ঘরের মেঝেতে বসে একসঙ্গে খেয়েছি কেবলমাত্র এটা অনুধাবন করার জন্য যে ‘প্রকল্প কিরণ’ তাদের জীবনে কতটা সুফল বয়ে আনতে পারে।’’

অবশেষে তার উদ্যোগ সফল হলো যখন ২০১৫-এর ২৩ জুলাই নারো কি খেদার একটি ঘরে আলো জ্বলে উঠলো অর্থাৎ প্রভোর পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলো। ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠলো নারোর ৭৬টি বাড়ি। বিদ্যুৎ ব্যবহারের পর গ্রামের লোকেদের চোখে মুখে আনন্দ ও বিস্ময়ের যে ভাব সে দেখেছিল তার সঙ্গে তার নিজের কথায় ‘professional accomplishment-এর কোনো তুলনা হয় না। যেটা কখনো আমি ভাবিনি যে অর্জন করবো।’’ তার এই প্রোজেক্টে প্রত্যেক বাড়ি পিছু বরাদ্দ আছে একটা সৌর প্যানেল, তিনটে লাইট বাল্ব, একটা স্ট্রিপলাইট ও একটা মোবাইল চার্জিং সকেট।

প্রভো সিং-য়ের স্বপ্ন সে ভারতের আরো এরকম অন্ধকার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবে। সে সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনাও চালাচ্ছে এই একই মডেলে, একই রেভিন্যু এবং সার্ভিস মেকানিজম-এর সাহায্যে আরো পঞ্চাশটা গ্রামে যাতে বিদ্যুৎ পৌঁছানো যায়।

প্রভোর এই উৎসাহ নিঃসন্দেহে গ্রামের উন্নতিকল্পে যুবকদের এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে। হয়তো ঈশান বালবালে, প্রভোর মতো যুবকরাই একদিন সমস্যাদীর্ণ ভারতীয় সমাজকে পরিবর্তন করে গড়ে তুলবে উন্নততর ভারত, সুষ্ঠু ভারত। এদের হাত ধরেই একদিন মুছে যাবে ইন্ডিয়া এবং ভারতের ব্যবধান।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

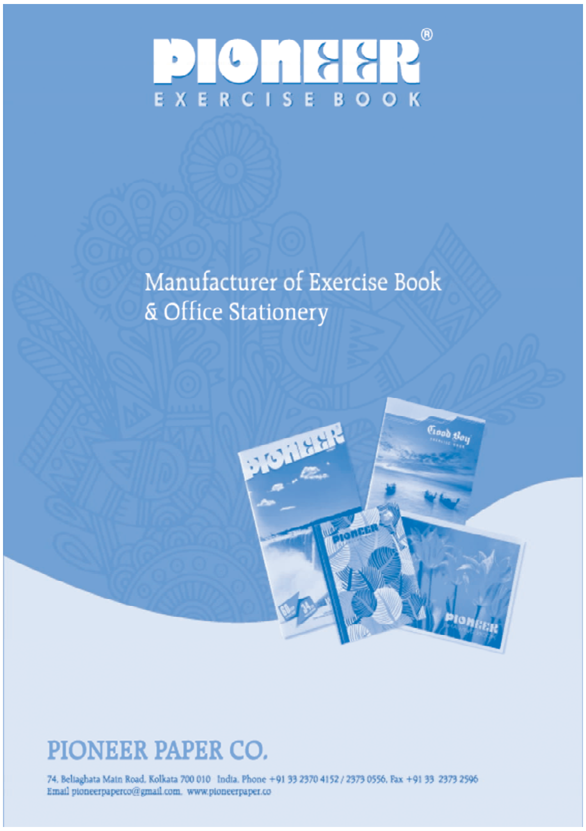

‘ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষের বাণী সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে স্থাপিত মানবতা ও মুক্তিরই বাণী।

একজন মহাপুরুষকে আমরা ধর্মের প্রবক্তারূপেই বেশি চিন্তা করি, তিনি যে জাতীয়তারও সংগঠক সে দিকটি কমই ভাবি। ভগবানের নাম আমরা অহরহ শুনি, কিন্তু নামের মাধ্যমে যে মানবপ্রেম শিক্ষা দেওয়া হয়, সেটা ভুলে যাই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভগবানের বার্তাবহ এবং তাঁর বাণী উভয়কে সমমর্যাদা দান— এশিয়াবাসীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার লক্ষ্যে চলেছে হিন্দুনিধন

সংবাদদাতা ॥ 'ভিটেমাটি ছাইড়া যাইতে পারি নাই তারই মাশুল গুইনতাছি এখন।' বৃদ্ধ টেনে টেনে কথাগুলো বলে হাঁফাতে শুরু করলেন। শীর্ণ বুকে হাপরের ওঠানামা। গালে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। বিস্ফোরিত চোখে শুধু ভয়। শেষ বিকেলের লালচে আলোয় ডুবু ডুবু সূর্যের দিকে তাকিয়ে মন কেমন করা গলায় বললেন, 'ধড়ের ওপর মুণ্ডুখান আজ আছে। কাল থাকবে কিনা কেউ জানে না!' বৃদ্ধের নাম মতিলাল দাস। সাকিন ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ। কিছুদিন আগে ঝিনাইদহ গ্রামের পুরোহিত আনন্দ গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়কে হত্যা করেছে জেহাদিরা। সেই হত্যার নৃশংসতাকে স্মরণ করে থরথর করে কাঁপছিলেন মতিলাল।

পদ্মপাতায় জল বললে ক্ষণস্থায়িত্বের একটা ছবি ভেসে ওঠে। অর্থাৎ জলের একটা বিন্দু এখনও আছে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। গড়িয়ে পড়বে অগাধ জলে। বাংলাদেশে হিন্দুদের জীবন এখন পদ্মপাতায় জলের মতো ক্ষণস্থায়ী। বলতে গেলে প্রায় প্রতি সপ্তাহে জেহাদিরা কাউকে না কাউকে হত্যা করছে। গোপালগঞ্জের নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে, ঝিনাইদহের আনন্দ গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, গাইবান্ধার দেবেশ চন্দ্র প্রামাণিক, যশোরের মুরারীমোহন মজুমদার, টাঙ্গাইলের নিখিল চন্দ্র জোয়ারদার। নামের তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। হত্যার পাশাপাশি চলছে লুট, অপহরণ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা। অথচ বাংলাদেশের আওয়ামি লীগ সরকার ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের অবস্থান নিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। ভাবখানা এরকম, বাংলাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান সহ আওয়ামি লিগের অন্যান্য মুসলমান নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত হয়েছিল, তারাই শুধু অপরাধী। আর জামাত হোক, আই এস হোক হিন্দুদের যারা হত্যা করছে তারা সব সাধুপুরুষ।

নির্বিকার হত্যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে। তিনি পাবনার শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্রের আশ্রমের সেবক ছিলেন। রোজকার মতো প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন কিন্তু আর ফেরেননি। এই ঘটনায় আতঙ্কিত ক্ষুব্ধ হিন্দুরা ভারতে চলে আসতে চাইছেন। অভিযোগ, প্রায়ই অদ্ভুত সব কারণ দেখিয়ে শাসক দলের স্থানীয় নেতারা তাদের হেনস্থা করেন। নিখিল চন্দ্র জোয়ারদারের কথাই ধরা যাক। নিহত হবার আগে তিন মাস তিনি কারাবন্দি ছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি হজরত মহম্মদের নামে কটূক্তি করেছিলেন। পড়শীরা এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করার ঝুঁকি নৃপেনবাবু কেন নেবেন! হত্যাকাণ্ডের পর একমাসের বেশি কেটে গেলেও পুলিশ এখনও কাউকে ধরতে পারেনি। পড়শীদের অভিযোগ, মিথ্যে ছুতোয় যারা তাকে জেল খাটিয়েছিল তারাই আছে হত্যার পিছনে।

হেনস্থার উদাহরণ এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত অভিযোগ করেছেন, আওয়ামি লীগ নেতা শাহিনুর রহমান ও তার বাহিনীর অত্যাচারে অন্তত ৩০টি হিন্দু পরিবার দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। পাঁচ বছর আগে পাশাপোল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর থেকেই শাহিনুর হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালানো শুরু করে। রানা দাশগুপ্ত জানালেন, 'শাহিনুরের কায়দাই হলো হিন্দু বাড়ির মেয়েদের অপহরণ করে আটকে রাখা। তারপর গণধর্ষণের ভয় দেখিয়ে বাড়ি সম্পত্তি সব লিখিয়ে নিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা।' সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে সদাব্যস্ত আর একটি সংস্থা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান কল্যাণ পরিষদ। সংগঠনের আহ্বায়ক গৌতম চক্রবর্তী বললেন,

শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্র আশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডের নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদ্‌যাপন সমিতি

পরিচালনায়—ক্রীড়া ভারতী, পঃ বঃ

আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবস উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলায় রানি রাসমণি রোডে সকাল ৬ টা থেকে যোগদিবস পালিত হবে। বিভিন্ন যোগ সংস্থার সহযোগিতায় এই যোগ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল **শ্রীকেশরীনাথ ত্রিপাঠী** উপস্থিত থাকবেন।

সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ নাগরিক, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যোগদিবসে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। পুরুষদের সাদা শার্ট অথবা গেঞ্জি এবং মহিলাদের সালোয়ার অথবা ট্র্যাকসুট পরে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়—

মেজর জেনারেল এস এন মুখার্জী (অঃ প্রাঃ) — সভাপতি

বিভাস মজুমদার — সম্পাদক

‘শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যে সমস্ত অমানবিক নির্যাতন আর ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে তা অকল্পনীয়।’ তাঁর কাছেই জানা গেল, সরকারের কাছে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, সম্পত্তি দখল, মন্দির মূর্তি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদ জানালে এখনও পর্যন্ত কোনো ঘটনার বিচার হয়নি। নামকাওয়াস্তে পুলিশ দু-একজনকে ধরে, তারপর এক সময় ধামাচাপা পড়ে যায়। এইভাবেই ধামাচাপা পড়েছে হাসিনা সরকারের মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনের প্রত্যক্ষ মদতে ফরিদপুরের জমিদারবাড়ি দখলের ঘটনা, ঠাকুরগাঁওয়ের সাংসদ দবিরুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের জমি দখল এবং পাবনার সাথিয়ায় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুর প্ররোচনায় হিন্দুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন।

সর্ষের ভেতরেই যেখানে ভূত সেখানে কে কাকে দেখবে! অথচ এক সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হিন্দুদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু এখন কোনো হিন্দুকে হত্যা করা হলে তিনি জামাত এবং বি এন পি-কে দোষারোপ করে দায় সারেন। অপরাধীরা যে ধরা পড়ছে না সে ব্যাপারে দৃকপাত করেন না। তিনি বলছেন, ‘বাংলাদেশের’ উন্নয়নে বাধা দেবার জন্য জামাত এবং বিএনপি-র মদতে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী এসব করছে।’ হিন্দু ব্যবসায়ীকে খুন করে আই এস তার দায় নেবার পরেও তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে আই এস নেই।’ হিন্দুরা ভরসা করতে পারেন না। রানা দাশগুপ্ত বললেন, ‘আই এস আছে কী নেই আমার মনে হয় সে বিতর্ক অর্থহীন। আই এস-এর উগ্র ভাবাদর্শ নিয়ে একটি চক্র নিরন্তর কাজ করে চলেছে। জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেবে না বলে আমাদের সরকারের যে বক্তব্য তা কিন্তু জনগণকে আশান্বিত করতে পারছে না। আমরা সবাই চাই এই ঘাতক চক্রকে উদঘাটিত করে বিচারের আওতায় আনা হোক।’

স্বাভাবিক ভাবেই এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দুদের জন্য ভারত সরকার কী ভাবছে? সম্প্রতি রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ রাম দাস আতাউল বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ না হলে ভারত চুপ করে থাকবে না বলে জানিয়েছেন। বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সনাতন ধর্ম সম্মেলনে বলেছেন, ‘আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের বলছি আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ থাকুন। ভারত সরকার আপনাদের পাশে আছে। কেউ আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না।’ শুধু সাহস দেওয়া নয়, নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে চলে আসা হিন্দু শরণার্থীদের যাতে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া যায় সেই ব্যাপারেও পরিকল্পনা করছে সরকার। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। বাংলাদেশ থেকে চলে এলে আর তাদের ফিরে যেতে হবে না। হারানো সন্তানের মতো ঘরে ফিরিয়ে নেবে ভারতবর্ষ!

কিন্তু তবুও প্রত্যয় হয় না। বৃদ্ধ মতিলাল অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অস্পষ্ট কয়েকটা ছায়া পড়ে চোখে। সে ছায়ায় আশা আছে, আশঙ্কাও আছে। বিড় বিড় করে বলেন, ‘নিজের জন্য চিন্তা নাই। পোলাপানগুলা যাতে বাঁইচাবর্তা থাকে সেই কথাই ভাবতাছি। অরা যদি যাইতে চায় তো যাক। আমি এখানেই মরুম।’

বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

With Best
Compliments from -

A
Well Wisher

B.M.

সমাবেশ সমাচার

জম্মুতে বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক

গত ২৮ থেকে ৩১ মে জম্মু-কাশ্মীরের জম্মুলোচন হলে সম্পন্ন হয় বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই বৈঠকের শুভ সূচনা করেন বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি ড. নাগেশ ঠাকুর, সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনয় বিঁদড়ে এবং সর্ব ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক সুনীল আম্বেকর। প্রত্যাশিত ৪০২ জন কার্যকর্তাদের মধ্যে ২৮৩ জন কার্যকর্তার উপস্থিতিতে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয় এই বৈঠক। বৈঠকের অন্য পদাধিকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক রঘুনন্দন, লক্ষ্মণ, শ্রীনিবাস প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যাশিত ১২ জন কার্যকর্তার মধ্যে ৯ জন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে নিম্নোক্ত সাতটি বিষয়ের উপর প্রস্তাব পাশ করা হয় :

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র হোক রাষ্ট্র নির্মাণ তথা সমাজ নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষায় ব্যবসায়ীকরণ রোধে শীঘ্রই কেন্দ্রীয় আইন তৈরি হোক। ক্যাম্পাসে দেশদ্রোহী কার্যকলাপে পুনরায় প্রকট হলো দেশবিরোধীদের আসল চেহারা। তপশিলি জাতি ও জনজাতি ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন বিশেষ নীতি। জম্মু-কাশ্মীর শান্তি, সমৃদ্ধি এবং বিকাশের পথে অগ্রসর হোক। চিকিৎসা শিক্ষার অনিয়মতাকে সরকার দূর করুক। পরিবেশ রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হোক যুবসমাজ।

বৈঠকের শুরুতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। অধিকাংশ কার্যকর্তার অংশগ্রহণে আলোচনায় উঠে আসে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক এবং সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি।

সাংগঠনিক অন্যান্য পর্যালোচনার মধ্যে ১ কোটি সদস্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা এবছর স্থির করা হয়। সদস্য সংগ্রহের জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। যাতে মিসড্‌কলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সদস্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। সদস্য হওয়ার জন্য মিসড্‌কল নাম্বার-১৮০০-২০৯-০৯৩০, এছাড়া এই বছর বিদ্যার্থী পরিষদ সুদূর গ্রাম্য জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করার জন্য 'সামাজিক অনুভূতি ২০১৬' নামক সমীক্ষা হাতে নিয়েছে। যাতে সারা দেশের সমস্ত রাজ্যে বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তারা সুদূর গ্রামে গ্রামে যাবেন এবং গ্রামের মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ অনুভব করবেন। এখও পর্যন্ত ছটি প্রদেশে এই ধরনের সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে যাতে ২৫ হাজার গ্রামের প্রায় ২ লক্ষ পরিবারের মধ্যে বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তারা পৌঁছেছেন এবং তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনেছেন।

সবশেষে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের পূর্বে জম্মু শহরে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক অভিনন্দন সমারোহ। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা তথা অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ড. নির্মল সিং।

কর্ণাটকে শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সম্মেলন

গত ২২ থেকে ২৪ মে মহীশূর শহরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক কানুপ্রিয় দাস (প্রাথমিক), গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মাধ্যমিক), অবনীভূষণ মণ্ডল (উচ্চমাধ্যমিক), কৃষ্ণ সরকার ও পাপিয়া মিত্র (উচ্চ শিক্ষা) এবং পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচি ছিল—১) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দু হোলোকাস্ট মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করার স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে দেওয়া—২) যাদবপুরে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে দমন করার জন্য সন্ত্রাস ও অধ্যাপক দেবাশীস চক্রবর্তীকে আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা।

দুর্গাপুরে সেবা বিভাগের চিকিৎসা শিবির

গত ২৬ মে আসনসোল জেলার দুর্গাপুর নগর সংলগ্ন গ্রাম ‘হেতেডোবায়’ সারাদিনব্যাপী চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয় সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায়। ‘সমাজ সেবা ভারতী’ ও ‘এন এম ও’র যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতি দুই মাস অন্তর স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ঘোষণা ‘প্রভাত এক প্রয়াস’ নামে দুর্গাপুরে শুরু হয় গত বছর নভেম্বর মাস থেকে। এখন পর্যন্ত দুটি বস্তি এবং দুটি গ্রামে ১৫০ রুগীর চিকিৎসা করানো হয়েছে। হেতেডোবা গ্রামে চতুর্থ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট নয়জন ডাক্তারের দল গ্রামে থেকে পরের দিন অর্থাৎ ২৬/৫-এ সারাদিন রোগী দেখেন। বিনামূল্যে ওষুধের ব্যবস্থা করেন স্থানীয় সংস্থা ‘বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদ।’ স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ তীর্থঙ্কর দেব এবং ডাঃ শ্রীমতী কুমকুম সরকার (স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন)। গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য প্রভাত গরাই শিবিরের পরিচালনা ও ব্যবস্থার বিষয়ে আন্তরিক সহযোগিতা করেন। কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্রও এই শিবিরে যোগ দেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ত্রিদিবসীয় সংস্কৃত ভাষাবোধন বর্গ

সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত নিমতিতা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গত ৩ থেকে ৫ জুন পর্যন্ত ত্রিদিবসীয় ভাষাবোধন বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। এই বর্গে অভিনব পদ্ধতি দ্বারা হাসি খেলা ও গানের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা এবং ব্যাকরণ শেখানো হয়েছে। বর্গে ১৫ স্থান থেকে ৩২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ঔরঙ্গাবাদ প্রণব বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সমীরণ সরকার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বর্গের উদ্বোধন করেন। সংস্কৃতভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী কমল শর্মা বর্গে তিন দিনই উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাড়াও বর্গের শিক্ষক ছিলেন সুমন্ত প্রামাণিক ও সুকান্ত প্রামাণিক। সর্ব ব্যবস্থাপ্রমুখ ছিলেন সুসীমমুকুল দাস ও রাজারাম দাস। গত ৫ জুন রবিবার বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন আহিরণ হেমাঙ্গিনী উচ্চবিদ্যালয়ের ভূগোল বিষয়ের প্রাক্তন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ দাস। বর্গের শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়েছেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অলিম্পিকের প্রস্তুতি মঞ্চ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জুনের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিই ভারতীয় হকি দলের অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। ভারতকে লন্ডনের এই প্রতিযোগিতায় খেলতে হয়েছে হল্যান্ড, জার্মান, গ্রেট বৃটেন, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে। অলিম্পিকে ভারতের গ্রুপে আছে হল্যান্ড ও জার্মানির মতো দুনিয়ার দুই সেরা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ভারতের পক্ষে ব্যাপারটি যথেষ্ট অবমাননাকর। অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে বেশিবার এই টুর্নামেন্ট জিতেছে। ভারতের প্রতিবেশী ও চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানও বেশ কয়েকবার খেতাব ঘরে তুলেছে। সেখানে ভারত তিনবারের সেমিফাইনালিস্ট ও একবারের ব্রোঞ্জ জয়ী। ভারতের চিফ কোচ রোনান্ট অল্টম্যান ও অধিনায়ক সর্দার সিং লন্ডন টুর্নামেন্টকে হাতিয়ার করে রিও ফ্লিকারের মধ্যে পড়েন। পাশাপাশি ডিপ ডিফেন্সকেও যথেষ্ট নির্ভরতা দেন। যে কয়েক বছর জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলেছেন, দুটো ব্যাপারেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

লন্ডন অলিম্পিকে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরমেন্স তুলে ধরতে পারেনি ভারত। তাই এই অলিম্পিক ভারতের সুদীর্ঘ হকি ঐতিহ্য ও গরিমার অগ্নিপরীক্ষাও বটে। তাই দেশের

দল। এছাড়া ভারতকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার জন্য রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার সেরা দল আর্জেন্টিনা, যারা অলিম্পিক কিংবা বিশ্বকাপে বেশ কয়েকবার ভারতের যাত্রাভঙ্গ করে ছেড়েছে। অলিম্পিকে দুটি গ্রুপে ৬টি করে অর্থাৎ ১২টি দল রয়েছে। এর থেকে চারটি করে দল নকআউট বা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে যাবে। তাই ভারতের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া হয়তো আটকাবে না। কিন্তু তারপর, সেমিফাইনালে উঠতে না পারলে এতদিনের সব পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফলাফল থেকেই ভারতের আন্তর্জাতিক হকিতে প্রকৃত অবস্থানটা বোঝা যাবে। সব সেরা দলই এই টুর্নামেন্টে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে খেলে। ভারত একবারও এই মর্যাদার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এককালের ধারাবাহিক অলিম্পিকের সাফল্যের কড়ি জোগাড় করে নিতে বিশেষ কিছু চিন্তাভাবনা করেছে যার ফল হাতেনাতে পাওয়া যাবে সামনের দিনগুলিতে।

মোটামুটি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলটাই রিও যাবে, এমনটাই ধরে নেওয়া যায়। একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হলেও হতে পারে। এরপর ভারত যাবে ইউরোপের আর এক উন্নত দেশ স্পেনে টেস্ট সিরিজ খেলতে। ওই সফরটাই অলিম্পিকের আগে শেষ স্টেজ রিহার্সাল। তাই টিম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে প্রশ্নটা উঠে আসে তা হলো এই টিমটাই কি ভারতের সেরা? তাহলে হকি ইন্ডিয়া লিগের সার্থকতা কোথায়। আরমান কুরেশি, ললিত উপাধ্যায় বা অভিজ্ঞ সন্দীপ সিংহের জায়গা হয় না কেন? দেশের সেরা শর্টকর্নার বিশেষজ্ঞকে কোন যুক্তিতে দলের বাইরে রাখা হয়। সন্দীপ বিশ্বের সেরা ড্রাগ সেরা দলটিই যে রিও যাবে এমনটাই আশা ও দাবি রাখে কোটি কোটি হকিপ্রেমী। তাই সন্দীপ-আরমানদের মতো যথার্থ যোগ্য খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করে শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দল নিয়ে ভারত রিও যাবে, এই দাবিতে সোচ্চার হওয়া উচিত সংবাদমাধ্যমের। সংবাদমাধ্যমের চাপে হকি ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর নতুন করে ভাববে এবং টিমের ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট হবে। কারণ অলিম্পিকে গোটা এশিয়ার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ভারতের। এই অলিম্পিকে পাকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়া নেই। ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা এশিয়া আর অলিম্পিকে অন্যান্য কিছু ইভেন্টে যতই ভাল ফল করুক ভারতীয়রা হকির সাফল্য ও পদকপ্রাপ্তির কাছে তা খানিকটা হলেও বিবর্ণ। কারণ অলিম্পিক তথা বৃহত্তম বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রকৃত পরিচয় ও অবস্থান যে হকির ঔজ্জ্বল্যেই।

শব্দরূপ-৭৯২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** ছল, ছুতা, মিথ্যা অজুহাত, **৩.** প্রেতোদ্দিষ্ট দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, **৪.** সম্ভ্রম, সম্মান, **৫.** '— রে কৃষিকাজ জানো না', **৬.** যখন তখন ডেকে যাকে কাজের ভার দেওয়া যায় এবং সর্বদা আদেশ পালনের জন্য যে কাছেকাছেই থাকে, **৮.** অহঙ্কার, **১০.** দাবা ইত্যাদি খেলায় বিপক্ষের পরাজয় ('বাজি —'), **১১.** শোভাযাত্রা, **১৩.** স্বর্গগঙ্গা, **১৪.** টিকাকরণের মাধ্যমে সম্প্রতি এই রোগটি নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

উপর-নীচ : **১.** সম্পত্তি পরিচালক, **২.** ইঙ্গ প্রতিশব্দে রেখা ('—টানা'), **৩.** মদন, কামদেব, **৫.** বহুমূত্ররোগ, **৭.** নায়কের আচরণ প্রীতিকর হলেও বিরক্তির ভান করে নিবারণার্থ হস্তাদি সঞ্চালন, **৯.** রমণী, স্ত্রী, সাদা সুগন্ধি ফুল বিশেষ, **১০.** 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর সেই বিখ্যাত সংলাপ, 'মাসিমা — খামু', **১২.** নৌকা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮৯

■	■	■	■	■	শি	বা	জী
■	ভা	র	বি	■	বা	■	মূ
আ	■	■	দা	মি	নী	■	ত
বো	ধো	দ	য়	■	■	■	বা
ল	■	■	■	ম	ধু	মে	হ
তা	■	দো	হা	র	■	■	ন
বো	■	য়া	■	ম	ৎ	স্য	■
ল	লি	ত	■	■	■	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

দীপক রঞ্জন দাস
চুঁচুড়া, হুগলী
টিঙ্কু হালদার
রায়গঞ্জ, উ: দিনাজপুর
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৭৯২ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ জুলাই ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

আর্থিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে। আত্মানুভূতির প্রচেষ্টায় যে সামাজিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগুলি রাষ্ট্র নিজ সহায়তার জন্য সৃষ্টি করে অথবা যে নিয়মরীতিতে তার আত্মার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, সেগুলিই যদি তার বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে গতি রুদ্ধ করে ফেলে, তাহলে তার থেকে মুক্তি পাওয়াও প্রত্যেক রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। যাত্রাপথে কোথাও কোনো উপকরণ উপযোগী হতে পারে, অন্য স্থানেও তা উপযোগী হতে হবে— এটা ঠিক নয়। উপকরণ সব স্থানে একই হতে হবে এই প্রকার মোহ পরাধীনতার কারণ হতে পারে। কেননা স্বাধীনতা কেবল সেই পদ্ধতির নাম যা স্ব-অনুভূতিতে সহায়ক হয়।

বৈদিকধর্মে পরিবর্তন সবসময় হয়ে চলেছে। এই ধর্ম গতিশীল, গঙ্গার মতো সদা প্রবহমাণ, তাই জীবন্ত। বদ্ধ জলাশয়ের মতো স্থির ও জীবাণুপূর্ণ নয়। ধর্মের মধ্যে সবসময় নবীন ভাবনার আগমন হয়ে চলে। সেই নবীন পরিবর্তন তার মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারকরা পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব রেখেছেন, পরম্পরাকে শ্রদ্ধা করেছেন, পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মকে সম্মান জানিয়েছেন। সেজন্যই তাঁরা নবীন ভাবনার প্রবর্তকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। মূলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁদের নবীন ভাবনা থেকে রাষ্ট্রজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সেজন্য নিরন্তর বিকাশ হয়ে চলেছে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। বিক্রমাদিত্য।। ২৫

রতনপুরে দেবী হনুমানজীর মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোনো এক বিদেশি পর্যটক একবার ভারত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়া ইজ দা ল্যান্ড অব ওয়ান্ডার্স।' ভারতবর্ষ হলো বিস্ময়ের ধাত্রীভূমি। তার মন্তব্যের জোরদার প্রমাণ পাওয়া গেল ছত্তিশগড়ের রতনপুরে। সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান পুরুষ নন, নারী। দেবতা নন দেবী। রতনপুর জেলার গিরিজাবানধে বিশাল মন্দির। মন্দিরে ঢুকলে দেখা যাবে বাঁ কাঁধে মাতা সীতাকে নিয়ে হনুমানজী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখ দক্ষিণ দিকে ফেরানো। তাই তিনি দক্ষিণী মূর্তি নামেও পরিচিত। কিন্তু সারা বিশ্বে যিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ রূপে পূজিত রতনপুরে তিনি হঠাৎ দেবী হলেন কেন? স্থানীয় লোকশ্রুতি, প্রাচীনকালে রতনপুরের রাজা ছিলেন পৃথি দেবজু। তিনি ছিলেন হনুমানজীর ভক্ত। দীর্ঘদিন ধরে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত রাজা যখন আরোগ্যের ব্যাপারে একেবারে হতাশ ঠিক তখনই হনুমানজী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন— রতনপুরে মন্দির বানাতে হবে। নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কাজ যখন প্রায় শেষ তখন পান দ্বিতীয় স্বপ্নাদেশ। এই মন্দিরে তাঁকে দেবতা নয়, দেবীরূপে স্থাপন করতে হবে। অতঃপর হনুমানজী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর রাজার অসুখও ভালো হয়ে যায়। সেই থেকে রতনপুরে চালু হয় দেবী হনুমানজীর পুজো।

২৭ বছর পর শতাব্দী প্রাচীন মন্দির খুললো শ্রীনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৯০ সালে জম্মু-কাশ্মীরের মাটি থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়নের পর বন্ধ হয়ে যাওয়া শতাব্দী প্রাচীন শৈবক্ষেত্র বৈতাল ভৈঁরো মন্দিরের দরজা গত এপ্রিলে পুনরায় উন্মুক্ত হলো।

শ্রীনগরের কেন্দ্রে সর্বাধিক কাশ্মীরি পণ্ডিতদের একদা বাসস্থান রাইওয়ারের যোগি লঙ্গর আবারও ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর ধর্মাত্মা ট্রাস্ট মন্দিরের সম্পত্তি বেআইনিভাবে স্থানীয় রিয়েল এস্টেট ডিলারদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা এখবর জানার পর কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এবিষয়ে জানালে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন।

নব্বইয়ের দশকে যেসকল কাশ্মীরি পরিবার ভিটে-মাটি ত্যাগ না করে ওখানেই ছিলেন, তাঁরা কাশ্মীরের মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাশ্মীরি পণ্ডিত সংঘর্ষ সমিতি (কেপিএসএস) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংস্থার হিসাবে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়নের পূর্বে এখানে ৫৮৩টি মন্দির ছিল। এর মধ্যে ৫৩২টি ক্ষতিগ্রস্ত এবং বাকি ৫১টি নিশ্চিহ্ন।

চীনে রোজা নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনের পশ্চিমপ্রান্তে জিনজিয়াং প্রদেশ। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের রমজান পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা রমজান মাসে রোজা রাখতে পারবে না। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কী কী শাস্তির মুখে পড়তে হবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তাও। বলা হয়েছে অবাধ্য ছাত্রছাত্রীরা পাশ করলেও ডিগ্রি দেওয়া হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত যেসব পাঠক্রম চাকরি পেতে সাহায্য করে সেখানে ভর্তি হবার সুযোগ মিলবে না। সুতরাং মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা যেন অধ্যাপকদের সামনে (অর্থাৎ সাক্ষী রেখে) ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রমজান মাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস (রোজা রাখা)— ইসলামের পাঁচটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বিবিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এদেশে নিরাপদে থাকতে চাইলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলাই ভালো।' জানা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টিভিতে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপবাস বিধির অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। খবরে প্রকাশ, মুসলমান অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশ ক্রমশ সন্ত্রাসবাদের আখড়া হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা হামলাও হয়েগিয়েছে। সন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদ করতে চীনের সরকার সম্প্রতি বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষেধাজ্ঞা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরকারি সক্রিয়তারই অঙ্গ বলে মনে করছেন কূটনীতি বিশেষজ্ঞেরা।

জতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
20 June - 2016 - Rs. 10.00

With Best
Compliments from

A
Well
Wisher

S.B.